সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

পাহাড় ঘেরা হ্রদের ধারে

পাহাড় ঘেরা হ্রদের ধারে

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

- ১ -

মাত্র পাঁচ সপ্তাহের ছুটি যেন চোখের কয়েকটা পলক ফেলতে না ফেলতেই ফুরিয়ে যায়। কথাটা অবশ্য ঠিক নয়, প্রথম কুড়ি-বাইশ দিনগুলোয় প্রতিটি মুহূর্তই যেন দ্রুত উড়ে যায়। তখনই শুরু হয় মন খারাপ ।

তখনই মা বলেন, আর দুটো দিন অন্তত থাকতে পারবি না ? বন্ধুরা বলে, টিকিট বদলে নে না! কিন্তু তা আর সম্ভব হয় না। সমুদ্রের ওপার থেকে ডাক এসে যায়।

তখন শুরু হয় দোটানা। এখানকার সব প্রিয়জন, আড্ডা, বাজারে গিয়ে জ্যান্ত ট্যাংরা মাছ কেনা, থিয়েটার, গানের জলসা ছেড়ে যেতে ইচ্ছে করে না। আবার ওদেশে অফিসের কাজ, একটা বাঙালি ক্লাবে নাটক করার কথা, ওখানেও তো একটা বাড়ি খালি পড়ে আছে...। একবার প্লেনে উঠলেই মনে হয়, আবার কবে দেখা হবে কে জানে! মা বেঁচে থাকবেন তো ?

কম দূর তো নয়, পৃথিবীর ওপিঠ।

কিন্তু এবারে দমদম বিমান বন্দরের মাটিতে পা দিয়েই শীলা বাসের দিকে না গিয়ে থমকে দাড়িয়ে পড়ল। তার চোখে জল । মুখটা নিচু।

এই সময় কাষ্টমস, ইমিগ্রেমশান, মালপত্তর উদ্ধারের চিন্তাই মন জুড়ে থাকে। বাইরে অপেক্ষা করছেন দাদা-বউদি, দুজন বন্ধু । সুধন্য অবাক হয়ে জি্জ্ঞেস করল,কী হলো ? তোমার পায়ে লেগেছে ?

জলে ভেজা মুখখানি তুলে শীলা ধরা গলায় বলল, আমি যদি আর ফিরে না যাই ? আমি দেশেই থাকতে চাই।

এ কথা শুনে সুধন্য মোটেই বিচলিত বোধ করল না।

শীলার এখন কয়েকদিন ঘনঘন মুড় বদলাবে। আগে থেকেই সে ঠিক দুর্গাপুরে মায়ের কাছেও গিয়ে থাকবে অন্তত দুসপ্তাহ। রাজস্থানেও বেড়াতে যাবার প্ল্যান আছে।

সে বলল, এখন তাড়াতাড়ি চলো। নইলে ইমিগ্রেশানে লম্বা লাইন পড়ে যাবে।

প্রত্যেকবারেই এই সময় চিন্তা হয়, সুটকেসগুলো ঠিকঠাক পাওয়া যাবে কি না ? অন্য যাত্রীদের মধ্যে কেউ কেউ টপাটপ তাদের মালপত্র পেয়ে যাচ্ছে, ওদের সুটকেসগুলো আর আসেই না। মোট চারখানা হয়েছে, কোনো একটা সুটকেস হারিয়ে গেলে আর দুঃখের শেষ থাকবে না।

অধীরভাবে অপেক্ষা করতে করতে একসময় দেখা গেল, তাদের একটা সুটকেস দুলতে দুলতে আসছে। কাছে আসতেই সুধন্য সেটা খপ করে ধরে নিল ।

শীলা বলল, এই, এই, ওটা আমাদের না!

সুধন্য বলল, এই তো ওপরে আমাদের নাম লেখা আছে।

শীলা তবু বলল, আমাদের না। আমাদেরটা সবুজ রঙের।

সুধন্য এবারে বেশ অবাক হলো, সেটা যে তাদের তাতে কোনো সন্দেহ নেই। মেয়েরা সাধারণত নিজেদের জিনিস চিনতে ভুল করে না। সুধন্যই বরং সুটকেসের রঙ মনে রাখতে পারে না, তাই প্রত্যেকটার ওপরে নাম লেখা আছে।

তাদের পাশেই এক মহিলা আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছেন, তার স্বামী একটার পর একটা সুটকেস নামাচ্ছেন।

এর মধ্যে দ্বিতীয় সুটকেসটা এসে গেছে।

সুধন্য সেটা ধরে নামাতে যেতেই শীলা বলল, এটা কি আমাদের ? ভুল হচ্ছে না তো ?

সুধন্য বলল, এই দ্যাখো, এটাতে তোমার নাম লেখা আছে।

শীলা তবু দ্বিধার সঙ্গে বলল, আমার নাম ?

সুধন্য হেসে বলল, তুমি কি নিজের নামটাও ভুলে গেলে নাকি ?

বাইরে টিপটপ বৃষ্টি পড়ছে। শীতকালের সন্ধেবেলার বৃষ্টি।

প্লেনটা দেড়ঘণ্টা লেট। দাদা-বউদিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে অনেকক্ষণ। সুধন্যর দুই বন্ধু, অতীশ আর শুভব্রত প্রত্যেক বছরই আসে। শীলার ছোটভাই জাম্বোও চলে এসেছে দুর্গাপুর থেকে।

আজকাল আর বিলেত-আমেরিকা সম্পর্কে কারুর তেমন মোহ নেই। চেনাশোনা অনেক পরিবারেই কেউ না কেউ ওইসব দেশে থাকে। এখন প্রবাসীরা দেশে আসেও অনেক ঘনঘন। খবরাখবর সবই জেনে যাওয়া যায়। ওয়াশিংটন ডিসি-তে তুষার ঝড় হলে কলকাতার মানুষ টিভিতেই তা দেখে নেয়।

বিয়ে হয়েছে সাড়ে ছ'বছর আগে, তারপর থেকে সুধন্য প্রত্যেক বছরই দেশে আসে। পৌঁছাবার দু'দিন পরেই সে সকালবেলা লেক মার্কেটে বাজার করতে যায় পাজামা-পাঞ্জাবি পরে, তখন আর তাকে দেখে বোঝাই যায় না যে সে বিদেশে থাকে। দুজন মাছওয়ালা তাকে চেনে, তারা হাত তুলে নমস্কার করে তাকে ডাকে ।

দু'তিনদিন কলকাতায় থাকার পর দুর্গাপুর। বউকে নিয়ে শ্বশুরবাড়িতে তো একবার যেতেই হবে সুধন্যকে । তবে দুদিন পর শীলাকে ওখানে রেখে সে ফিরে আসে কলকাতায় ।

দেশে ফেরার প্রধান আকর্ষণই তো বন্ধু-বান্ধবদের সঙ্গে আড্ডা। দুর্গাপুরে তার নিজস্ব পরিচিত কেউ নেই।

এবারে দুর্গাপুর পৌঁছবার পরদিনই শীলা জিজ্ঞেস করল, তুমি কাল কলকাতায় ফিরে যাবে ?

সুধন্য বলল, হ্যাঁ। সেরকমই তো ট্রেনের টিকিট কেটে এসেছি।

শীলা বলল, কেন ফিরে যাবে ? সুধন্য বলল, কেন মানে, আমার পাড়ার ক্লাবের ছেলেরা এই রোববার দুপুরে আমায় নেমন্তন করেছে। রণজয় আমারই জন্য ছুটি নিয়ে চলে এসেছে ব্যাঙ্গালোর থেকে ।

তুমি চলে গেলে, আমি এখানে কী করব ?

সে কি ? তুমি তো চাও তোমার বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটাতে।

বাবা-মায়ের সঙ্গে কতক্ষণ সময় কাটাব ? বাবা-মায়ের সঙ্গে সময় কাটানো কি সময়ের হিসাব ধরে হয় ? সারাক্ষণই তো কাছাকাছি থাকা যায়। কত গল্প থাকে।

না। সন্ধেবেলা তুমি না থাকলে আমার ভালো লাগে না। তুমি যেয়ে না।

সুধন্য একটুক্ষণ চুপ করে রইল ।

বিয়ের পর সাড়ে ছ'বছর কেটে গেলে তো মাঝে মাঝে কথা কাটাকাটি হবেই। ছোটখাটো ঝগড়াও হয়। দেশে ফেরার আগে ওরা ঠিক করে এসেছে, একটা দিনও ঝগড়া-টগড় করে সময় নষ্ট করবে না ।

সুধন্য জানে, এরপর সে জোর করে কলকাতায় ফিরতে চাইলে শীলা দারুণ মেজাজ খারাপ করে থাকবে ।

সে বলল, আচ্ছা ঠিক আছে, তা হলে টিকিটটা ক্যালসেল করে দিচ্ছি ।

শীলা বলল, ট্রেনের টিকিটের কী-ই বা এমন দাম! আচ্ছা শোন, তুমি পেঁপের তরকারি একেবারে পছন্দ কর না, তাই না ?

সুধন্য বলল, পেঁপের তরকারি ? পছন্দ করব না কেন ? আমি ভালোবাসি বলে মা প্রায় রোজই কুচো চিংড়ি দিয়ে পেঁপের তরকারি রাধে । তোমার বোধহয় ভালো লাগে না।

এই রে, কে বলল, তোমাকে? তোমার মায়ের হাতের সব রান্নাই আমার ভালো লাগে ।

তুমি আজ পেঁপের তরকারি নিতে চাও নি।

আগে অতটা লাউ-চিংড়ি খেলাম, এত চমৎকার, তাছাড়া দু'খনি বেগুন ভাজা, তাই পেঁপের তরকারিটা রাত্তিরে খাব ঠিক করেছি।

তুমি কই মাছও খাও নি।

শোন কুহু, আমি এ বাড়িতে পুরোনো হয়ে গেছি, তবু এখনো এত জামাই আদর, এতরকম রান্না, সব খাব কী করে ? কাটা বেছে কই মাছ খেতে তো ভুলেই গেছি!

এবারে শীলা ফিক করে হেসে বলল, ঝিল্লি যখন তোমাকে জোর করে পায়েস খাওয়াবার চেষ্টা করছিল, তখন তোমার মুখের যা অবস্থা হয়েছিল! পায়েস খাও নি, ভালোই করেছ।

সুধন্য বলল, আর কটা দিন এখানে থাকলে খুব মোটা হয়ে যাব।

মিষ্টি খেয়ো না। মাছ-তরকারি বেশি খেলেও ক্ষতি নেই।

শীলার হাসি দেখে আশ্বস্ত হলো সুধন্য। যাক, তাহলে আর পেঁপের তরকারিটা কোনো ঝগড়ার বিষয় হবে না।

দুর্গাপুরেও বৃষ্টি হচ্ছে রোজ। শীতকালে এমন বৃষ্টি স্বাভাবিক নয়। বেশ ঠান্ডাও পড়েছে। যদিও সুধন্যরা যে শহর থেকে এসেছে, সেখানে একটু হাটু সমান বরফ, তারা এসেছে নিজেদের দেশে রোদ পোহাতে। কোথায় রোদ, এখানেও তাদের শীত লাগে। এই বৃষ্টির মধ্যে বেরুনোও যায় না।

তবু প্রতিদিনই সন্ধেবেলা দলে দলে ছিল মানুষ আসে। শীলাদের অনেক আত্মীয়স্বজনই থাকে দুর্গাপুর-আসানসোলের দিকে। সুধন্যদের বাড়ি আগে ছিল দক্ষিণ ২৪ পরগনার এক গ্রামে, এখন কলকাতায়। তার চেনাগুনোর গণ্ডি ওদিকে ।

অচেনা মানুষদের সঙ্গে সুধন্য মিশতে পারে না, তবু সে হাসিমুখে সবার কথার উত্তর দেবার চেষ্টা করে ।

শীলার বাবা ইঞ্জিনিয়ার ছিলেন, রিটায়ার করার পর খুব ধর্মের দিকে ঝুঁকেছেন। সুধন্য নিজে নাস্তিক, প্রথম প্রথম সে শ্বশুরের সঙ্গে তর্ক করার চেষ্টা করত। পরে বন্ধু-বান্ধবেরা তাকে বুঝিয়েছে, পাগল ছাড়া কেউ নিজের শ্বশুরের সঙ্গে তর্ক করে না। অন্যের শ্বশুরের সঙ্গে যা খুশি করা যায়।

শীলার বাবা অতীশ দে সরকার সন্ধের পর কিছুটা মদ্যপান করেন। এই ব্যাপারে জামাই আর শ্বশুরে খুব মিল। শ্বশুরের জন্য বিদেশ থেকে অতি উত্তম পানীয় নিয়ে আসে সুধন্য। সন্ধের পর অতীশ দে সরকার যখন গেলাস হাতে নিয়ে বসেন, তখন সুধন্য তাঁকে সঙ্গ দেয়। এই সময় বেরসিক কেউ এসে পড়লে তিনি বিলক্ষণ চটে যান। তবু, কেউ না কেউ তো আসেই ।

বন্ধ হয়ে গেছে, খুব হই হই হলো সারা দিন।

রাত্তিরবেলা শোওয়ার ঘরে সুধন্য একটা রহস্য কাহিনীর শেষ কটা পাতা পড়ছে, শীলা ক্রিম মাখছে হাত আর পায়ে।

শীলা হঠাৎ বলল, তোমাকে আমি এখানে আটকে রেখেছি, তাই না ?

গল্পটার শেষ দিকে এতই উত্তেজনা আর উৎকণ্ঠা যে সুধন্যর আর কোনো দিকে মনই নেই। সে শুনতে পেল না শীলার কথা ।

শীলা আবার বলল, সেইজন্যই এখানে এসে আমার সঙ্গে কথা বলতে তোমার ইচ্ছেও করে না!

শীলার কণ্ঠস্বর একেবারে অন্যরকম। তাই এবারে চমকে উঠে সুধন্য বই থেকে চোখ তুলে জিজ্ঞেস করল, কী বললে?

শীলা একদৃষ্টিতে চেয়ে আছে তাৰ স্বামীর দিকে ।

সুধন্য যেন শীলাকে চিনতেই পারছে না, এমনই বদলে গেছে তার মুখের চেহারা। জ্বলজ্বল করছে চোখ, ডান হাতে ধরা বড় চিরুনিটা যেন চিরুনি না, একটা ছুরি।

শীলার এরকম পরিবর্তন দেখলে সুধন্যর বুক কেপে ওঠে । এটা কি কোনো মানসিক অসুখের লক্ষণ ?

মাস ছয়েক আগে ফিলাডেলফিয়ায় একটা গাড়ীর অ্যাকসিডেন্টে শীলার মাথায় চোট লেগেছিল। শীলার চেয়েও সুধন্য আহত হয়েছিল বেশি। তারপরও ডাক্তারের দু'তিনবার শীলাকে সবরকম পরীক্ষা করে বলেছে, ওর মাথায় কিংবা শরীরে কোথাও কিছু ক্ষতি হয় নি। যেটুকু লেগেছিল, ওষুধে সেরে গেছে।

তবু কেন হঠাৎ হঠাৎ শীলার এরকম পরিবর্তন হয় ? এক এক সময় সে পুরোনো কথা ভুলে যায়। এমন কথা বলে, সুধন্য যার মানে বুঝতে পারে না ।

এই সময় শীলার কথার কোনো প্রতিবাদ করলে ও আরও জ্বলে ওঠে ।

সুধন্য তাই চুপ করে ওর দিকে চেয়ে রইল।

শীলা আবার ভাঙা ভাঙা গলায় বলল, তুমি কি আমাকে বিয়ে করেছ, দিনের পর দিন দুর্গাপুরে ফেলে রাখার জন্য ?

আবার চমক। বিয়ের তিন মাস পর থেকেই আমেরিকায় থাকে শীলা। দুর্গাপুরে আসে মাত্র কয়েকদিনের জন্য।

এ কথার উত্তর দিতেই হয় ।

সুধন্য বলল, দেশে আসবার আগে থেকেই তো তুমি বলছিলে, দুর্গাপুরে মায়ের কাছে বেশিদিন সময় কাটাবে। আমাকেও থাকতে বললে—

শীলা বলল, মায়ের কাছে বেশিদিন থাকতে ভালো লাগে না। সবসময় একই তো কথা হয়। এক গল্প । আমার কি অন্যরকম একটা জীবন নেই ? কলকাতায় কত নতুন নতুন থিয়েটার হয়, কত গানবাজনার অনুষ্ঠান হয়, সেসব দেখব না ? শুধু লাউ-চিংড়ি খেতে দেশে এসেছি ? তুমি আমায় কলকাতায় নিয়ে যেতে চাও না কেন বল তো ?

সুধন্য এবার হাসল। তারপর খুব নরম গলায় বলল, কুহু, চলো, কালই আমরা কলকাতায় চলে যাই ।

- ২ -

সুধন্যর বাবা-মা নেই অনেকদিন। দাদা-বউদির সংসার। তার ছোট বোন ঋতুও এখানে থেকেই পড়াশোনা করে। ভবানীপুরে ওদের বাড়িটা পৈতৃক ।

সৌভাগ্যবশত বউদি সুনন্দার সঙ্গে শীলার খুব ভাব হয়ে গেছে একেবারে প্রথম থেকেই। দুজনেই দুজনকে খুব পছন্দ করে। বাড়ির বউদের মধ্যে যদি হিংসা কিংবা ঈর্ষার ভাব থাকে, তাহলে ভাইয়ে-ভাইয়ে সম্পর্কও নষ্ট হয়ে যায়। এ বাড়িতে সে সম্ভাবনা নেই।

বউদি শিক্ষিত মহিলা, একটা কলেজে ইংরেজি পড়ান। শীলা বিয়ের সময় সাধারণ গ্রাজুয়েট ছিল, ওদেশে গিয়ে মন দিয়ে পড়াশোনা করে ইতিহাসে পিএইচডি করেছে। ঋতুও পড়াশোনায় চৌকস, ভালো গান গায়, এ বাড়িতে সবসময় ভালো আড্ডা আর গান-বাজনা হয়।

শীলা একটার পর একটা থিয়েটার দেখতে লাগল, আর সুধন্য চুটিয়ে আড্ডা দিতে লাগল বন্ধুদের সঙ্গে ।

শীলার এখানে বেশ মেজাজ ভালো আছে । তার ব্যবহারে সামান্য স্বাভাবিকতা নেই। শীলার সরল, সহজ, হাসির শব্দ শুনে সুধন্য বেশ শান্তি পায়। তার ধারণা হলো, শীলার মনের মধ্যে যেটুকু মেঘ জমে ঠেছিল, তা কেটে গেছে।

দিন চারেক বাদে, রাত্তিরবেলা শীলা নিজেদের ঘরের নিভৃতে সুধন্যকে জিজ্ঞেস করল, আমাদের যে রাজস্থানে বেড়াতে যাবার কথা ছল, তা কি তুমি ভুলে গেছ ?

খুব স্বাভাবিক গলায় প্রশ্ন, চোখ জ্বলছে-টলছে না, ঠোঁটে হাসি মাখা।

সুধন্য বলল, না, না, ভুলব কেন ? আমি ভাবছিলাম, আর তো হাতে বেশিদিন নেই। রাজস্থানের বদলে বেনারস গেলে কেমন হয় ? তুমি তো বেনারসও দেখ নি ।

শীলা বলল, রাজস্থানে গেলে বুঝি খরচ বেশি হবে ? তুমি খুব কিপ্টে হয়ে গেছ।

আরে না, না, সে জন্য নয়! আমার খুব রাজস্থানে যাওয়ার ইচ্ছে। তার আগে দিল্লি যাব। আমাদের ফেরার তো আর এগারো দিন বাকি আছে।

ঠিক আছে। তাই যাব। রাজস্থানের বিশেষ কোনো জায়গায় যেতে চাও?

তা জানি না। গেলেই হলো। কত ফোর্ট আর প্যালেস আছে। তবে শোন, আমি কিন্তু ফিরে যাওয়ার আগে আর একবার দুর্গাপুরে গিয়ে মাকে প্রণাম করে আসব। মাকে আমি এবার একটা খারাপ কথা বলেছি, তাই মনটা খচখচ করছে।

সে কি ! মাকে । কী খারাপ কথা বলেছ ?

আদেখলাপনা!

তার মানে ? আমার ছোট বোন রিনি আর ওর বর সুকান্ত এসেছিল । সুকান্তকে পাত্তাই দিচ্ছিলেন না, তোমাকে বেশি বেশি খাতির করছিলেন। কেন ? তুমি আমেরিকায় থাক বলে ? এটা আদেখলাপনা ছাড়া আর কী ? তবে মায়ের মুখের ওপর এই কথাটা বলা আমার উচিত হয় নি।

সত্যি উচিত হয় নি। আমি তো সুকান্তকে নিয়ে বেরিয়ে গেলাম। অনেক গল্প হলো। খুব গুণী ছেলে, ছবি এঁকে গোল্ড মেডেল পেয়েছে। ওর তুলনায় আমার তো কোনো গুণই নেই।

ওই যে, আমেরিকা আছে!

দিল্লিতে থাকে সুধন্যর ছেলেবেলার বন্ধু তপন । সে এখন ইংরেজি কাগজের সাংবাদিক ।

তপনকে টেলিফোন করল সুধন্য । তুই রাজস্থানে একটা জায়গা ঠিক করে দে। বেড়াবার সব বন্দোবস্ত, কী করে যাওয়া হবে, কোথায় থাকা হবে । সব যেন ব্যবস্থা করা থাকে।

তপন জিজ্ঞেস করল, রাজস্থানে তো দ্রষ্টব্য স্থান অনেক । তোরা কোথায় যেতে চাস ঠিক করেছিস ?

জয়পুর, উদয়পুর জয়সলমির, যে কোনো একটা জায়গা, বেশিদিনের জন্য নয়, বড় জোর তিন-চার দিন ।

শোন, সুধন্য, এখন ইন্টারনেটে পৃথিবীর যে-কোনো জায়গায় বুকিং করা যায়। তুই ওদেশ থেকেই সব ঠিক করে আসিস নি কেন ? এটা পুরোপুরি টুরিষ্ট সিজন। প্রচুর এন আর

আই আর সাহেব- মেমরাও শীতকালে রাজস্থানে বেড়াতে আসে। তুই এত দেরি করে বললি, এখন জায়গা পাওয়া শক্ত হবে ।

সেটা আমার ভুল হয়ে গেছে, আসার আগে বড় ব্যস্ত ছিলাম। ওদিকের কাজকর্মও গুছিয়ে আসতে হয়। দু'খানা ঘর বুক করবি । তোকেও যেতে হবে আমার সঙ্গে ।

আমি যাব ? ধ্যাৎ। আমার বুঝি কাজ নেই ? তাছাড়া তুই নতুন বউকে নিয়ে হানিমুন করতে যাবি।

নতুন বউ ? সাড়ে ছ'বছর বিয়ে হয়ে গেছে।

এখনো তো বাচ্চা-কাচ্চা হয় নি। যতদিন না ছেলে-মেয়ে হয়, ততদিন বউয়েরা নতুন বউই থাকে।

তুই জানলি কী করে ? তুই তো বিয়েই করলি না এতদিনেও।

ব্যাচেলাররা পরস্ত্রীদের সম্পর্কে ভালো জানে।

পরদিন তপন দুঃসংবাদ দিল । কোথাও ভদ্রগোছের কোনো হোটেলে ঘর খালি নেই। এক-দেড়মাস আগে থেকেই সব বুকিং হয়ে যায়।

সুধন্য প্রায় আঁতকে উঠে বলল, এই রে কী বলছিস রে তপন তা হলে যে আমার বউয়ের কাছে মান-সম্মান কিছুই থাকবে না। ওকে কথা দিয়েছি।

রাজস্থানের বদলে উত্তরপ্রদেশে, সেখানেও অনেক ভালো ভালো জায়গা আছে, কিন্তু ভিড় কম। রাজস্থান নিয়ে বড্ড বেশি পাবলিসিটি হয় ।

না, না। শীলা রাজস্থান ছাড়া আর কোথাও যাবে না। তুই আবার দ্যাখ, বড় জায়গা দরকার নেই, ছোটখাটো কোনো জায়গা হলেও হবে। মোটামুটি পরিষ্কার কোনো সাধারণ হোটেল। আর আমাদের সঙ্গে তুইও যাবি।

যদি একটামাত্র ঘর পাওয়া যায় ?

না, প্লিজ, তোকে যেতেই হবে। আমি এক অচেনা জায়গায় সবকিছু সামলাতে পারি না।

শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেল। আলওয়ার নামে একটা ছোট শহর থেকেও খানিকটা দূরে, পাহাড়ের ওপর একটা সরকারি গেষ্ট হাউস, তাতে দুটোমাত্র ঘর খালি আছে। তাও ছিল না, একজন কেউ রিজার্ভ করেও ছেড়ে দিয়েছে।

সুধন্য স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

শীলাও খুব খুশি, তবু সে একটা সমস্যার সৃষ্টি করে ফেলল। তার খুব ইচ্ছে, ঋতুকে সঙ্গে নিয়ে যাবে।

কিন্তু ঘর তো মাত্র দু'খানা। ঋতু থাকবে কোথায় ?

শীলা বলল, তোমার ওই বন্ধুর আসার কী দরকার ? ওকে বলে দাও—

সুধন্য বলল, সে কি! তপন আসতে চাইছিল না, আমিই ওকে বিশেষ অনুরোধ করেছি। সব ব্যবস্থা হয়ে গেছে। এখন ওকে বারণ করা যায় ?

শীলা বলল, তোমার নিজের বোনের চেয়ে বন্ধুর টান বেশি ? বন্ধুকে বল যে তোমার বোনকে সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছ!

এইরকম সময় মেজাজ ঠিক রাখা মুশকিল। তবু সুধন্য অতিকষ্টে মেজাজ ঠিক রাখল। এখন রাগারগি করলে শীলা যে কী কাণ্ড বাধাবে, তা কে জানে!

সুধন চুপ করে আছে, শীলা বলল, ঋতুকে না নিয়ে গেলে আমিও যাব না ভাবছি। নাঃ, আমিও যেতে চাই না!

এতেও বিচলিত না হয়ে সুধন্য বলল, ঠিক আছে, ঋতুকে নিয়ে যাওয়া যেতেই পারে। তপন আর আমি একঘরে থাকব, তুমি আর ঋতু একসঙ্গে ব্যস, তা হলে আর কোনো সমস্যাই রইলো না।

শীলার মুখ-চোখ আবার খুশিতে উদ্ভাসিত হয়ে গেল। সে বলল, ও মা, তাই তো, এটাই তো খুব ভালো ব্যবস্থা।

ঋতুকে সে ডেকে বলল, জামা কাপড় গুছিয়ে নাও। ওখানে কি খুব শীত হবে ?

সুধন্য যখন তপনকে ফোন-টোন করছে, তখনো শীলা একবারও ঋতুকে নিয়ে যাওয়ার কথা বলে নি। এমনকি ঋতুকেও বলে নি কিছু।

এখন ঋতু এই প্রস্তাব শুনে আকাশ থেকে পড়ল, সে বলল, বউদি, তোমায় কতবার বলেছি না, এই সোমবার আমার পরীক্ষা ?এখন আমি তোমাদের সঙ্গে বেড়াতে যাব ?

শীলা বলল, পরীক্ষা না দিলে কী হয় ? সব পরীক্ষা কি দিতেই হবে ?

সুধন্য বলল, জীবনের অনেক পরীক্ষা না দিলেও চলে। কিন্তু এ তো কলেজের পরীক্ষা! দিতেই হয় ।

শীলা অন্যমনস্কভাবে বলল, জীবনের পরীক্ষা ? কী জানি ? তারপরও বেশ কিছুক্ষণ সে অন্যমনস্ক হয়ে রইল।

যাই হোক, মিটে গেল ঝামেলা। ঋতু যাচ্ছে না। এটা এমন কিছু ব্যাপার নয়। কিন্তু শীলার অন্যমনস্কভাবে বারান্দার জানালার দিকে চেয়ে অনেকক্ষণ বসে থাকাটা ঠিক যেন স্বাভাবিক মনে হয় না।

দিল্লিতে একটা রাত থাকতে হবে, পরেরদিন গাড়ী নিয়ে বেরিয়ে পড়া।

তপনের বড় ফ্ল্যাট, সেখানে থাকার কোনো অসুবিধাই নেই। তপন সব ব্যবস্থাও করে রেখেছে। শীলা হঠাৎ বলল, গ্রেটার কৈলাশে ওর এক মামাতো ভাই আছে, তার কাছে থাকবে। এই সুযোগে দেখা হবে ওদের সঙ্গে ।

সকালবেলা সবাই মিলে তপনের বাড়ি থেকে একসঙ্গে বেরুনোই সুবিধের, নইলে তপনকে আবার আসতে হবে উল্টো দিকে। সুধন্য তাই বলল, যাওয়ার সময় আমরা তপনের বাড়িতেই থাকি। ফেরার সময় এক রাত আমরা থাকব শুভজিৎদের বাড়িতে। সেটাই ভালো হবে না ?

শীলা বলল, শুভজিতের সঙ্গে আমার ফোনে কথা হয়েছে। এই সোমবার ও অফিসের কাজে চলে যাচ্ছে সিঙ্গাপুরে। আমরা ফেরার সময় ও থাকবে না। তা হলে আর দেখাই হবে না।

সুধন্য বলল, শুভজিৎকে অনুরোধ করা যায় না, তপনের বাড়িতে এসে দেখা করে যেতে। সন্ধেবেলা যদি আসে, একসঙ্গে খাওয়াদাওয়া, করা যেতে পারে। তপনের বাড়ির ঠিক পাশেই একটা বেশ ভালো চাইনিজ রেন্টুরেন্ট আছে, ওখান থেকে খাবার আনিয়ে নিলে—

শীলা বলল, তুমি আমার কোনো আত্মীয়ের বাড়িতে থাকতে চাও না, তাই না ? তোমার প্রেস্টিজে লাগে।

সুধন্য আস্তে আস্তে বলল, দিল্লিতে আমারও কাকা থাকেন। আত্মীয়দের বাড়ির চেয়ে বন্ধুদের কাছে থাকলে অনেক সহজ হওয়া যায়। তপন স্কুলে ক্লাস ফোর থেকে আমার সঙ্গে পড়েছে। ঠিক আছে, আমরা শুভজিতের বাড়িতেই থাকব।

শীলা বলল, না, থাক। তোমার যখন এত ইচ্ছে, আমি শুভকে না বলে দিচ্ছি। তপনের বাড়িতেই—

সুধন্য বলল, কুহু, এ নিয়ে কথা কাটাকাটির কোনো মনে হয় না। তোমার যখন ইচ্ছে হয়েছে—আমরা ফেরার সময়েই তপনের বাড়িতে থাকব। এটাই সহজ ব্যাপার।

ব্যাপারটা এইভাবে মিটিয়ে ফেলল বটে, তবু সুধন্যর মনের মধ্যে যেন ছোট্ট একটা কাটা বিধে রইলো। সবসময়ই শীলার কথা তাকে মেনে নিতে হচ্ছে। এতে যেন লাগছে তার পৌরুষে। পুরুষ মানুষ যত সূক্ষ্মভাবেই হোক, নারীর ওপর আধিপত্য চায় ।

শুভজিৎ ছেলেটি বেশ ভালো, বুদ্ধিমান, স্বাভাবিক ব্যবহার। বেশ জমে উঠল রাত্তিরের আড্ডা।

সকালবেলা তপন এসে তুলে নিল ওদের।

সুধন্যর মনে মনে একটু আশঙ্কা ছিল, শীলা বোধহয় কোনো কারণে অপছন্দ করে তপনকে। যদি তার সঙ্গে ভালো ব্যবহার না করে ? একসঙ্গে বেড়াতে বেরিয়ে যদি একজনের সঙ্গে আর একজনের কিছুটা টেনশন থাকে, তাহলে বেড়াবার আনন্দটাই নষ্ট হয়ে যেতে পারে।

সুধন্যকে অবাক করে দিয়ে শীলা তপনকে দেখেই বলল, ওমা, কী আশ্চর্য, এই এক বছরে এতখানি ফ্যাট কমিয়ে ফেললেন কী করে ? কী সুন্দর হয়েছে আপনার চেহারা।

তপন বলল, আর তুমি তো দেখছি, এখনো সেই নতুন বউটিই রয়ে গেছ শুধু আর একটু লম্বা হয়েছ, মনে হচ্ছে ?

শীলা বলল, ভ্যাট! এই বয়সে কেউ আর লম্বা হয় নাকি ? তপন বলল, সামান্য একটু রোগা হয়েছ, তাই একটু লম্বা লাগছে? শীলা সাধারণ বাঙালি মেয়েদের তুলনায় একটু বেশি লম্বা। রোগা পাতলা নয়, ভরাট শরীর, তবে কোমরের গড়ন দেখলেই বোঝা যায়, শরীরে মেদ নেই। গায়ের রং গৌরবর্ণ, কিন্তু খুব ফর্সা নয়। তার ঠোঁটে একটা ছেলেমানুষি ভাব আছে।

গাড়ি চালাচ্ছে তপন নিজেই।

একটু পরে শীলা বলল, জানেন, আপনার বন্ধু আমার ওপর রেগে আছে। কারণ, আমি একবার বলেছিলাম, আপনাকে বাদ দিয়ে ওর বেনি ঋতুকে নিয়ে আসতে।

তপন বলল, ঋতুকে নিয়ে এলেই তো হতো। কিন্তু তার জন্য আমাকে বাদ দিতে হবে কেন ?

শীলা বলল, দুটোমাত্র ঘর, কে কোথায় থাকবে।

তপন বলল, তাতে কোনো সমস্যা ছিল না। আমি তো ড্রাইভার, ড্রাইভারদের ঘরে শুতাম ।

সুধন্য বলল, আমি মোটেই রাগ করি নি। আসলে ঋতুকে কিছু না জিজ্ঞেস করেই কুহু ঠিক করে ফেলেছিল। কিন্তু সে বেচারার এখন পরীক্ষা ।

শীল বলল, পরীক্ষা না ছাই। এখন আবার কিসের পরীক্ষা ? আসলে ওর বয়ফ্রেন্ডের জন্মদিন আজ, ওরা সারা দিন একসঙ্গে কাটাবে।

তপন বলল, ঋতুরও বয়ফ্রেন্ড হয়েছে বুঝি ? ওকে কত ছোট দেখেছি।

সুধন্য বলল, রাজস্থানের ঠিক কোথায় আমরা যাচ্ছি রে তপন ?

তপন বলল, আমি যে জায়গায় ঘর বুক করেছিলাম, সেটা খুবই সুন্দর জায়গা শুনেছি। কিন্তু আমার একজন প্রতিবেশী, গত মাসেই সে জায়গাটা ঘুরে গেছে। সে বলল, সুন্দর জায়গা ঠিকই, কিন্তু থাকার বেশ অসুবিধে আছে। খাওয়া-দাওয়ারও। সেইজন্য তোরা আমাকে গালাগাল না করিস, তাই আমি আলোয়ার শহরেও কয়েকটা হোটেলের নাম নিয়ে এসেছি । আলোয়ারেই থাকব, কোনো না কোনো হোটেলে জায়গা পাওয়া যাবে ।

শীলা জিজ্ঞেস করল, আলোয়ার শহরে কী আছে ?

তপন বলল, এখানে বিশেষ কিছু দেখার নেই, পুরোনো প্যালেস-ট্যালেস আছে অবশ্য, তবে, এখান থেকে ভরতপুর যাওয়া যায়। ভরতপুর বার্ড সাংচুয়ারির নাম শুনেছিস নিশ্চয়ই। সারিসকা রিজার্ভ ফরেষ্টেও যাওয়া যায় ।

শীলা জিজ্ঞেস করল, আপনি আগে যে জায়গাটা ঠিক করেছিলেন, সেই জায়গাটার নাম কী ?

তপন বলল, শিলিশের। খুব বেশি লোক নাম শোনে নি।

শীলা বলল, আমি ওখানেই থাকতে চাই ।

সুধন্য বলল, আগে সেই জায়গাটায় গিয়ে দেখা যাক। যদি পছন্দ না হয়, আলোয়ারে ফিরে আসব।

শীলা বলল, না, না, একটা শহরের হোটেলে থেকে কী হবে ? পাহাড়ই ভালো। একটু-আধটু অসুবিধে হলেও মানিয়ে নেব।

দিল্লি থেকে বাইরে বেরুতেই অনেকখানি সময় লেগে যায়। রাস্তা একেবারে জ্যাম-জমাট। তারপর একটু ফাকা জায়গায় এসে এক জায়গায় লাঞ্চ খেতে হলো ।

আলোয়ার শহরটায় খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে বেশ ভালোই লাগল সুধন্যর। রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন। এখানে অনায়াসে থাকা যায়।

একটা বড় হোটেলের সামনে গাড়ি থামিয়ে তপন জিজ্ঞেস করল, দেখব এখানে ঘর খালি আছে কি না ?

শীলা বলল, না। আমি সেই জায়গাটাতেই যাব, কী যেন নাম, শিলুশেট ?

তপন বলল, না, শিলিশের। কিন্তু সেখানে যেতে যেতে সন্ধে হয়ে যাবে ।

তা হোক না!

খানিকটা পাহাড়ের ওপর দিয়ে পথ। ঠিক সন্ধে বলা যায় না, শেষ গোধূলি । সারা আকাশে অস্তায়মান সূর্যের আভা ।

হোটেলটার সামনে পৌছে ওরা তিনজনই বেশ বিস্মিত। এ যেন বর্ণনার চেয়েও চাক্ষুষ দৃশ্য অনেক বেশি সুন্দর।

লেক মানে ছোটখাটো কিছু নয়, বিশাল বড় হ্রদ। পাহাড়ের ওপর এমন জলাশয় খুবই অপ্রত্যাশিত। চতুর্দিক পাহাড়ে ঘেরা। একপাশে এই বিশাল প্রাসাদ, সেটা একটা হোটেল। অল্প আলোয় সবকিছুই খুব মোহময় লাগে ।

গাড়ি থেকে নেমে লেকের ধারের পাঁচিলের দিকে এগিয়ে গেল শীলা ।

একটুক্ষণের মধ্যেই তার এই মুগ্ধতা কেটে গেল, গলা দিয়ে বেরিয়ে এল ভয়ের চিৎকার।

অনেকগুলো বাঁদর তাকে ঘিরে ধরেছে । অন্তত চৌদ্দ-পনেরোটা তো হবেই।

শীলার আর্তনাদ শুনে দৌড়ে এল সুধন্য।

বাঁদরগুলো ছোট-বড় নানান আকারের। কয়েকটা গোদা বাঁদর লাফিয়ে লাফিয়ে কী সব শব্দ করছে। সেট তাদের অভ্যর্থনার ভাষা, না ভয় দেখানোর, তা বলা মুশকিল।

শীলা কুকুর-বেড়াল কিংবা কোনো জন্তু জানোয়ারই পছন্দ করে না। আরশোলা-টিকটিকি দেখলেও সিটিয়ে যায়। সুধন্য কাছে আসতেই সে তাকে প্রায় জড়িয়ে ধরে ওরে বাবারে, ওরে বাবারে বলতে লাগল।

সুধন্য হুস হুস করে বাঁদরদের তাড়াবার চেষ্টা করতে করতে বলল, ভয় নেই, বাঁদর কিছু করে না!

শীলা কাপা কাপা গলায় বলল, বাঁদর কামড়ে দেয়।

সুধন্য হেসে বলল, না, না, বাঁদর কামড়ায় না। ওরা খাবার চাইতে আসে।

শীলা বলল, আমার ছোট মামাকে বেনারসে একটা বাঁদর একবার কামড়ে দিয়েছিল।

সুধন্য বলল, সেটা নিশ্চয়ই ইতিহাসে একবারই হয়েছে। এই দ্যাখো না, আমি তাড়িয়ে দিচ্ছি।

সে বীরদর্পে খানিকটা তাড়া করতেই বাঁদরেরা দূরে সরে গেল ।

শীলা মিনমিন করে বলল, এই বাঁদরদের নিয়ে এখানে থাকতে হবে ।

তপন কাছে এসে বলল, কী জায়গাটা পছন্দ হয়েছে তো ? চল, আমাদের ঘর দুটো দেখে আসি।

রাজপ্রাসাদটি পাহাড় কেটে বানানো হয়েছে বলেই এর গড়নটা একটু অদ্ভুত ধরনের।

তলার দিকটা অনেকখানি ছড়ানো। একটা বারান্দা লেকের ধার ঘেঁষে, ঘুরে গেছে অনেকখানি। তারই পাশে পাশে বেশ কয়েকটি ঘর।

সেই তুলনায় দোতলায় ঘরের সংখ্যা কম। এখানেই অফিস ঘর আর খাবার ঘর।

ওরা পাথরের সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠে আসার পরই আলো নিভে গেল। পাহাড় অঞ্চলে হঠাৎ সন্ধে হয়ে যায়। একটু আগেও সূর্যের আলো ছিল, এখন একেবারে অন্ধকার।

তপন জোরে বলল, কিছু দেখতে পাচ্ছিন। এখানে কেউ আছেন ?

অন্ধকার থেকে উত্তর এল, একটু অপেক্ষা করুন। এক্ষুনি আলো - জ্বলবে। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই ঝাঁ ঝাঁ শব্দ শুরু হলো। জেনারেটর। আলোও জ্বলল ।

অফিস ঘরে বসে আছে একজন অত্যন্ত সুপুরুষ তেইশ-চব্বিশ বছরের ব্যক্তি। ছবিতে যেসব রাজপুত্রদের চেহারা দেখা যায়, অবিকল সেইরকম, হরতনের গোলামের মতন গোঁফ । হোটেলের ম্যানেজারের বদলে কোনো সৈন্যবাহিনীর সেনাপতি হলেই তাকে বেশি মানাত ।

তপন নিজের পরিচয় দিয়ে বলল, নমস্কার, আমাদের দুটো রুম বুক করা আছে।

লোকটি বলল, হ্যাঁ জানি। আপনারা একটু দেরি করে ফেলেছেন। আগে দরকারি কথাটা বলে নিই। আপনারা রাত্তিরে কী খাবেন ? এক্ষুনি অর্ডার না দিলে রাত্তিরে আর খাবার পাবেন না। আমাদের কুক ন'টার মধ্যে বাড়ি চলে যায় ।

সুধন্য একবার শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, আগে তো ঘর দেখতে হবে। যদি পছন্দ না হয়। বাথরুম যদি খারাপ হয়, আমার স্ত্রী থাকতে পারবেন না।

লোকটি আবার বলল, কিন্তু দেরি করলে যে খাবার পাবেন না! তপন এবার দৃঢ় গলায় বলল, ঘর দেখতে কতক্ষণ লাগবে ? আপনার কুক পাঁচ দশ মিনিট অপেক্ষা করতে পারবে না ?

লোকটি বলল, আপনারা তো আগেই টাকা জমা দিয়ে দিয়েছেন। পছন্দ না হলে — টাকা ফেরত দেওয়ার কোনো সিস্টেম নেই।

তপন আর একটু কড়া গলায় বলল, টাকার প্রশ্ন উঠছে কেন ? পছন্দ না হলে থাকতে হবে নাকি ? চলুন আগে ঘর দেখান। আপনার নাম কি ?

লোকটি বলল, আলতাফ হোসেন। আমি জানি, রুম আপনাদের পছন্দ হবেই! এখানকার সবচেয়ে সেরা ঘর।

সিঁড়ি দিয়ে ওপরে উঠতে উঠতে আলতাফ আবার বলল, এই ঘর দুটো সবচেয়ে উচুতে। অনেকটা সিঁড়ি ভাঙতে হয় বলে, বয়স্ক লোকেরা নিতে চায় না। আপনাদের নিশ্চয়ই সে অসুবিধে নেই।

সুধন্য বলল, না, আমাদের সিঁড়ি ভাঙার অসুবিধে নেই।

একেবারে ওপরে ছাদে দুটিমাত্র ঘর। এক হিসেবে খুব নিরিবিলি ।

ছাদের আলো জ্বালার পর আলতাফ বলল, এই ঘর দুটোর নাম কিংস রুম আর কুইনস রুম। কুইনস রুমটাই বেশি বড়। আগে সেটাই দেখাই ।

চাবি খুঁজতে লাগল আলতাফ।

তপন জিজ্ঞেস করল, এই প্যালেসটা কত দিনের পুরোনো ?

আলতাফ বলল, খুব বেশি পুরোনো নয়। একশ পয়ষট্টি বছর। আলোয়ারের মহারাজ বিনয় সিং এটা বানিয়েছিলেন।

তপন বলল, একসময় এই রাজস্থানে অনেক ছোট ছোট রাজ্য ছিল, সেখানকার রাজারা নিজেদের বলতেন মহারাজ। তারা আর কিছু পারুন বা না পারুন, অনেক বড় বড় রাজপ্রাসাদ বানাতেন। নিজেদের জাঁকজমক দেখাবার জন্য ।

চাবি দিয়ে ঘরটা খুলতে খুলতে আলতাফ বলল, এই প্যালেসটা কেন বানানো হয়েছিল জানেন ? তা নিয়ে একটা গল্প আছে।

এ ঘরখানা মস্ত বড়। মাঝখানে একটা পালঙ্ক। একদিকের দেয়ালজোড়া আয়না। অন্যদিকে খুব পুরোনো আমলের একটা আলমারি ।

শীলা চট করে বাথরুমের দরজাটা খুলে ভেতরটা দেখে নিল ।

সুধন্য বলল, কী ঠিক আছে ?

শীলা আমতা আমতা ভাবে বলল, হ্যাঁ, এমনিতে ঠিক আছে, তবে কোথা থেকে যেন জল পড়ে, মেঝেটা একেবারে ভেজা!

আলতাফ বলল, সে আমি লোক পাঠিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি।

তপন বলল, আমার তো মনে হয় আলতাফ সাহেব ঠিকই বলেছেন। ঘরটা অপছন্দ করার কোনো কারণ নেই। ফার্নিচারগুলো অ্যান্টিক, আজকাল কোনো হোটেলে এরকম দেখা যায় না।

সুধন্য জিজ্ঞেস করল, এই প্যালেসটা তৈরির কী একটা গল্প আছে বলছিলেন ?

আলতাফ বলল, মহারাজ বিনয় সিং শিকার করতে ভালোবাসতেন। এখানে চতুর্দিকেই তো বন-জঙ্গল, একসময় অনেক জন্তু জানোয়ার ছিল শুনেছি। বিনয় সিং শিকার করতে আসতেন এদিকে একবার তিনি দেখলেন, এই লেকের অন্য পাড়ে কয়েকটি মেয়ে স্নান করছে। তাদের মধ্যে একজন অপরূপ সুন্দরী। রাজার খুব পছন্দ হয়ে গেল তাকে ।

তপন বলল, এইসব রাজারা ছিল এক নম্বর ডিবচ। রাজ্যে সুন্দরী মেয়ে দেখলেই ধরে ধরে নিয়ে যেত ।

আলতাফ বলল, না স্যার, এই বিনয় সিং ছিলেন ভদ্র । তিনি মেয়েটিকে ধরে নিয়ে যান নি। মেয়েটির বাড়িতে লোক পাঠিয়ে জানালেন, তিনি তাকে বিয়ে করতে চান। সব নিয়ম-কানুন মেনে। মুসলমান নবাবদের মতোন রাজপুতরা হারেমে রাখতেন না। বিয়ে করতেন।

তপন বলল, ওই একই কথা হলো, বউ থাকত ডজন ডজন।

সুধন্য বলল, সে তো ভাই তোমাদের ব্রাহ্মণরাও বিয়ে করত ডজন ডজন কেন, পঞ্চাশ-একশটাও ।

শীলা বলল, দাড়াও না। গল্পটা শুনি! তারপর কী হলো ?

আলতাফ বলল, মেয়েটির মা খুব জেদি ছিলেন। রাজা বিয়ে করতে চাইলে কে আর না বলার সাহস দেখাতে পারে । তিনি বললেন, মেয়ের সঙ্গে রাজার বিয়ে দিতে রাজি আছেন। কিন্তু এক শর্তে। মেয়েকে রাজধানীতে নিয়ে যাওয়া চলবে না। মেয়েকে তার কাছাকাছি রাখতে হবে। যাতে তিনি রোজ মেয়েকে একবার দেখতে পান। এ শর্তে রাজা রাজি না হলে তিনি মেয়েকে বিষ খেতে বলবেন। রাজা এই শর্ত মেনে নিলেন। বিয়ের পর তিনি নতুন রানীর জন্য বানিয়ে দিলেন এই মস্ত বড় প্যালেস ।

তারপরই আলতাফ শীলার দিকে নাটকীয়ভাবে ঘুরে তাকিয়ে বলল, সেই রানীর নাম আর আপনার নাম একই । শীলা ।

শীলা দারুণ চমকে উঠে বলল, আপনি আমার নাম জানলেন কী করে ?

আলতাফ বলল, কাল যখন আপনাদের তিনজনের নামে বুকিং শ্লিপ এল, তাতেই আপনার নাম দেখলাম। আমাদের একজন পুরোনো কর্মচারী বললেন, এর আগে শীলা নামে আর কেউ এখানে আসেন নি।

তপন বলল, শীলার প্রত্যাবর্তন। একেবারে মার্কিন দেশ থেকে। সেই রানী শীলার বাড়ির লোকজন সবাই এসে এখানেই থাকতে শুরু করেছিল ?

আলতাফ বলল, না স্যার। আমি তো বেশি হিস্ট্রি জানি না, যতটা শুনেছি, আর কারুর এখানে থাকার হুকুম ছিল না। দাস-দাসী নিয়ে রানী একাই থাকতেন। মাঝে মাঝেই পালকি নিয়ে গ্রামের বাড়িতে দেখতে যেতেন মা-বাবাকে। মহারাজও প্রায়ই শিকার করতে এসে কয়েকটা দিন থেকে যেতেন এখানে। মহারাজ অবশ্য বেশিদিন বাচেন নি। তারপরও রানী অনেকদিন একাই থাকতেন। বয়েস হয়ে গেলে তিনি আর বিশেষ বেরুতেন না, বেশির ভাগ সময়ই কাটাতেন এই ঘরটায়। এখানেই তিনি মারা যান।

তপন বলল, সেও তো অনেকদিন হয়ে গেল নিশ্চয়ই। অন্তত একশ বছর।

আলতাফ বলল, এখনো নাকি সেই রানী এই বাড়ির টানে ফিরে আসেন মাঝে মাঝে। কেউ কেউ তাকে দেখেছে, খুটখুট করে হাটছেন ছাদে ।

তপন বলল, এইবার শুরু হলো ভূতের গল্প। পুরোনো বাড়ি হলে ভূত থাকতেই হবে। এই যে ভাই, তুমি নিজে কখনো সেই রানীর ভূতকে দেখেছ ?

আলতাফ বলল, না, স্যার। আমার তো মাত্র চার বছরের চাকরি। তিনি বলতেন যে-

তাকে শেষ করতে না দিয়ে সুধন্য বলল, ভূত কেউ নিজে দেখে না। অন্যেরা দেখে। সেই গল্প ছড়ায়।

তপন হাসতে হাসতে আলতাফকে বলল, আপনি তো ভাই হোটেলের ম্যানেজার হিসেবে খুব খারাপ। ভূতের গল্প শুনলেই তো অনেক অতিথি ভয়ে পালিয়ে যাবে।

সুধন্য বলল, ফরচুনেটলি। কুহু একেবারে ভূতের ভয় পায় না। ওর ভয় শুধু চোর-ডাকাত, বাঁদর-ভালুক, উচ্চিংড়ে এইসবকে।

আলতাফ বলল, ঠিক আছে, আমি তাহলে নিচে যাচ্ছি। এবারে আপনারা যদি খাবারের অর্ডার দিয়ে দেন। ন'টার মধ্যে খেয়ে নিতে হবে। এখানকার সব স্টাফরা সেই সময় চলে যায়।

তপন বলল, কেন চলে যায় ? ভূতের ভয়ে ?

আলতাফ বলল, না, না। কাছাকাছি গ্রামে এদের বাড়ি। ফ্যামিলির সঙ্গে রাত কাটাতে যায়। আমার ফ্যামিলি দিল্লিতে, তাই আমি একাই থাকি এখানে ।

বাইরে কিছু একটু আওয়াজ হতেই শীলা জানলা দিয়ে তাকাল। তারপরেই বললে, ও মা গো, ওরা এখানেও এসেছে ?

ছাদের পাচিলে সার বেঁধে বসে আছে ডজন দেড়েক বাঁদর।

সুধন্য বলল, এই বাঁদরগুলো কোথা থেকে আসে বল তো ?

তপন বলল, বাঁদরেরা কোথা থেকে আসে, তা শুধু বাঁদরেরাই বলতে পারে। ওরা কেন আসে, আর কেন চলে যায়, তাও ওরাই জানে!

আলতাফ বলল, কাছাকাছি এত জঙ্গল, তবু ওরা কিন্তু কোথাও যায় না। পুরুষানুক্রমে এই বাঁদরের দলটা এখানেই থাকে। রানী শীলাদেবী নাকি বাঁদরদের ভালোবাসতেন। ওদের খাবারটাবার দিতেন রোজ ।

তপন বলল, এখনো কি তিনি ভূত হয়ে ওদের খাবার দিতে আসেন নাকি ? আলতাফ বলল, না, না, স্যার, ওসব কিছু ভাববেন না। আপনাদের কোনো অসুবিধে হবে না। ঘরের দরজা সবসময় বন্ধ করে রাখবেন। না হলে দুএকটা বাঁদর ঢুকে পড়তে পারে। ঘরে এসে জিনিসপত্র ঘাটাঘাটি করে।

শীলা চোখ কপালে তুলে আর্তস্বরে বলল, অ্যা। ঘরে ঢুকে আসবে ? বাঁদর ? তা হলে আমি এখানে থাকব না। চলো, আলোয়ার চলো। শহরই ভালো।

সুধন্য বলল, দাড়াও, দাড়াও ।

শীলা বলল, না, এখানে থাকা অসম্ভব ।

আলতাফ বলল, ম্যাডাম, আপনার বাঁদরে এত ভয় ? সে ব্যবস্থাও আছে। পুরোনো আলমারিটা খুলে সে ভেঁপুর মতোন একটা মোটা বাঁশি বের করল।

তারপর বলল, যখনই দেখবেন, কোনো বাঁদর দরজা কিংবা জানলার কাছে এসেছে, এই বাঁশিটা বাজাবেন। দেখবেন, তক্ষুনি ওরা ল্যাজ তুলে পালাবে ।

তপন বলল, বাঁশির আওয়াজ শুনলে বাঁদর পালায়, এমন তো কখনো শুনি নি। এ কখনো হতে পারে ?

আলতাফ বলল, কেন পালায় তা জানি না। তবে আমাদের এখানকার এই বাঁদরগুলো বাশির শব্দ সহ্য করতে পারে না ।

তপন বলল, পরীক্ষা করে দেখাই যাক।

জানলার কাছে গিয়ে সে গাল ফুলিয়ে জোরে ফু দিল বাঁশিটায়। বেশ জোর একটা বেসুরো শব্দ হচ্ছে।

অমনি বদরগুলো সত্যি সত্যি কিচিরমিচির করতে করতে অদৃশ্য হয়ে গেল ।

- ৩ -

খাওয়াদাওয়ার পর কিছুক্ষণ গল্প হলো ছাদে বসে। এখানে কয়েকটা চেয়ার দেওয়া আছে ।

এখন খানিকটা জ্যোৎস্না ফুটেছে, অস্পষ্টভাবে দেখা যায় হ্রদটা। তিনদিকের পাহাড় খুবই অস্পষ্ট। আর অস্পষ্ট পাহাড় সবসময়ই রহস্যময় মনে হয়। কোথাও যেন দেখা যাচ্ছে দু'একটা আলোর ফুলকি।

শীত পড়েছে বেশ। তাই বেশিক্ষণ বাইরে বসা যাবে না। শীলা শীতকাতুরে, সে একটু আগেই ঘরে চলে গেছে। দুই বন্ধু ব্র্যান্ডির গেলাস নিয়ে আরও চালাল আধঘণ্টা। তারপর উঠে পড়তে হলো। মাথায় হিম পড়ছে।

সুধন্য বলল, লেকটা বেশ বড়, কাল সকালবেলা ভালো করে ঘুরে দেখতে হবে ।

তপন বলল, সকালের দিকে এখন খুব ফগ হয়। দিল্লি এয়ারপোর্টে তো রোজই সকালে কয়েক ঘণ্টা ফ্লাইট বন্ধ থাকে।

সুধন্য বলল, লেকের বাংলা হ্রদ, তাই না? আজকাল আর প্রায় কেউ বলেই না। বালিগঞ্জের হ্রদ বললে কেমন অদ্ভুত শোনাবে না ?

তপন বলল, ভাষা তো বদলায়ই । লেক কথাটি এখন বাংলা হয়ে গেছে।

সুধন্য বলল, হ্যাঁ, ভাষা বদলাই ঠিকই। কুয়াশাও এখন ফগ। তুই একটু আগে যে কথাটা বললি, সেটাকে যদি এরকম ভাবে বলা যায়, সকালের দিকে এখন খুব কুয়াশা হয়। দিল্লি বিমানবন্দরে তো রোজই সকালে কয়েক ঘণ্টা উড়ান বন্ধ থাকে, তাহলে কেমন শোনাবে?

তপন বলল, তাহলে মনে হবে, তুই একটা গত সেঞ্চুরির মানুষ । ভাষা বদলায়, মানুষও বদলায়। একশ বছর আগে, তুই অনায়াসে দুতিনটে বিয়ে করতে পারতি। আমার গ্রান্ডফাদারেরই তো দুটো বিয়ে ছিল ।

সুধন্য বলল, আমরা একটা বিয়ে করেই হিমশিম খেয়ে যাই। তখনকার দিনে ওঁরা দুতিনটে বউ সামলাতেন কী করে ?

তপন বলল, তখনকার দিনের লোকের স্ট্যামিনা ছিল। খাটি ঘি খেত তো। চলি রে, বড্ড শীত করছে, গুড নাইট!

সুধন্য নিজের ঘরে এসে দেখল, শীলা মুখে, হাতে ক্রিম মাখছে। মেয়েদের বিছানায় যাবার আগে প্রতিদিন এই কাজটা করতে হয় ।

একটা ছোট টেবিলের ওপর রয়েছে দুটো মোমবাতি আর দেশলাই । তার মানে রাত্তিরে আলো না-ও থাকতে পারে।

একটা রুম হিটার দিয়ে গেছে। সুধন্য সেটার কাছে গিয়ে একটু হাত-পা সেঁকে নিতে লাগল।

শীলা বলল, আমাদের ওখানকার তুলনায় এদেশে শীত বেশি লাগে, তাই না ? আমি তো বাইরে বসতেই পারছিলাম না।

সুধন্য বলল, আমেরিকাতেও এই সময় বাইরে বসা যায় না। সে প্রশ্নই ওঠে না।

শীলা বলল, কিন্তু ফিলাডেলফিয়ায় তো এখন মাইনাস সেভেন। বরফ পড়ছে। এখানে তো জিরোও না। ম্যানেজার তখন বলল, রাত্তিরে চার পাঁচ হয়। আমাদের ওদিকে তো ফোর ফাইভ মানে বেশ ভালো ওয়েদার ।

সুধন্য বলল, সবই আপেক্ষিক। এই রুম হিটারগুলোয় মোটেই সারা ঘর গরম হয় না।

শীলা জিজ্ঞেস করল, তুমি এখন বাথরুমে যাবে ? আমি একবার ঘুরে আসি ?

এসো ।

সুধন্য কাচের জানালার কাছে গিয়ে দাঁড়াল। বাইরেটা প্রায় কিছুই দেখা যায় না। তবে একটু দূরে অস্পষ্ট শব্দ হচ্ছে। খুব সম্ভবত বাঁদরগুলো কাছাকাছি ফিরে এসেছে। আসুক। দরজা-জানালা সব বন্ধ।

সে একবার ভাবল, বাঁদরেরা তো মানুষেরই পূর্বপুরুষ। ওদের শীত লাগে না ? আহা বেচারা বাদরেরা পাহাড়ের গুহাতেও থাকতে শিখে নি।

বাথরুমের মধ্যে কিসের যেন একটা শব্দ হলো। প্রথমটা বোঝা গেল না, দ্বিতীয়বার আবার হতেই সুধন্য বুঝতে পারল, শীলা কোনো কারণে ভয় পেয়েছে। তাড়াতাড়ি সে বাথরুমের বন্ধ দরজার কাছে এসে জিজ্ঞেস করল, এই কুহু, কী হয়েছে ?

ভেতর থেকে শীলা বলল, কিছু না।

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সে আবার চিৎকার করে উঠল, এ কী ? কে ?

এবার দুম দুম করে দরজায় ধাক্কা দিয়ে সুধন্য বলতে লাগল, কুহু কী হয়েছে! দরজাটা খোল-

শীলা তক্ষুনি দরজাটা খুলল না। ভেতরটা নিস্তব্ধ।

সুধন্য ব্যস্ত হয়ে আরও জোরে দরজা ধাক্কাতে লাগল।

কয়েক মুহূর্ত পর খুলে গেল দরজা। শীলার সহজ, স্বাভাবিক মুখ, ভুরু দুটিতে বিন্দু বিন্দু জল ।

সুধন্য উদ্বিগ্নভাবে বলল, কী ব্যাপার ? কী হয়েছিল ?

শীলা বলল, কই, কিছু হয় নি তো ?

তুমি যে হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠলে ?

চেঁচিয়েছি বুঝি ?

বাঃ, তুমি যে বললে, এ কী ? কে ?

দরজাটা ঠেলে বাথরুমের মধ্যে উকি দিল সুধন্য। তারপর বলল, এখানে তো আর কেউ নেই। থাকবেই বা কী করে ? আমি ভাবলুম, কোনো বাঁদর-টাদর বুঝি কোনোরকমে ঢুকে পড়েছে।

শীলা এবার সামান্য হেসে বলল, না তা নয়। একটা জিনিস দেখবে এসো!

ভেতরে একটা দেয়ালে প্রমাণ সাইজের আয়না। শীলা সেটার সামনে দাড়িয়ে বলল, এখানে চুল আঁচড়াচ্ছি, হঠাৎ দেখি পেছনে আর একজন দাঁড়িয়ে । একটি মেয়ে । আমারই বয়েসি । গায়ে একটা লাল চাদর। সে-ই কি এখানকার সেই রানী ?

সুধন্য এবার শীলার কাঁধে হাত রেখে বলল, কুহু, এটা কী হচ্ছে ? তুমি কি ভূত দেখা শুরু করলে ?

শীলা বলল, যাঃ, মোটেই না। ভূত বলে কিছু আছে নাকি ?

তা হলে ? ভূত তো দেখি নি। রানীকেই দেখেছি।

কুহু, কাম অন, তোমার মতোন একটা শিক্ষিত মেয়ে একটা গল্প শুনেই ভূত দেখা শুরু করলে ?

বলছি তো, মোটেই তা নয়। ভূত বলে কিছু নেই, এটা যেমন সত্যি, তেমনি আমি রানীকে একঝলক দেখেছি, এটাও সত্যি!

এর মানে কী হলো ?

মানে হলো, যা নেই, তাও দেখা যায় কখনো কখনো। কোনো কিছু সম্পর্কে খুব গভীরভাবে চিন্তা করলে—

এবার বুঝেছি। তুমি গল্পটা শোনার পর রানী শীলাদেবী সম্পর্কে খুব বেশি একটা ছবি তৈরি করে নিয়েছ। দ্যাট মেকস সেনস। তবে, তুমি যখন জানোই যে ওটা একটা ছবি, তা হলে ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলে কেন ?

প্রথমে বুকটা একটু ছ্যাঁৎ করে ওঠেই। ছবি নয়, মনে হচ্ছিল একেবারে জীবন্ত ।

বেশ। রানীকে কেমন দেখলে ? খুব সুন্দরী ?

সুন্দরী তো বটেই। টানা টানা চোখ, পাতা-কাটা চুল। আমারই বয়েসি। একেবারে দুধে-আলতা গায়ের রঙ, ক্লাসিক বিউটি যাকে বলে। ঠোঁটে পাতলা হাসি ।

ইস, আমারও একবার দেখতে ইচ্ছে করছে। কিন্তু আমায় দেখা দেবে না। আমি যে বড় বেশি যুক্তিবাদী! ঠিক আছে, এবার তুমি বাইরে যাও, আমি বাথরুম সেরে নিই—

একটু বাদে বাথরুম থেকে বেরিয়ে এসে সুধন্য বলল, নাঃ, আয়নার দিকে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইলাম, আমার ভাগ্যে রানী-দর্শন নেই। আয়নাটার ওপর ধুলো জমে আছে, পরিষ্কার করা দরকার।

শীলা বলল, এটা দ্যাখো । একটা ওড়না । এখনো নতুনের মতোন আছে। এরকম ওড়না আজকাল কেউ ব্যবহার করে না। এটা আলমারির মধ্যে ছিল ।

সুধন্য বলল, তুমি কি ভাবছ, ওটা রানীর ওড়না ? ইমপসিবল। একশ বছর আগেকার কোনো ওড়না ওরকম টাটকা থাকতেই পারে না।

তবে এটা আলমারিতে রইল কী করে ?

আলমারির পাল্লা খোলা। আগেকার কোনো গেষ্ট ভুল করে ফেলে গেছে নিশ্চয়ই ।

রকম এত চুমকি বসানো ওড়না আজকাল কেউ ব্যবহার করে ?

অনেক পুরোনো পোশাকের স্টাইল আবার নতুন করে ফিরে আসে। আমরা বিদেশে থাকি, আমরা কি সব খবর জানি ? শোন কুহু, আমি কিন্তু শুয়ে পড়ছি। এরকম শীতে দুখানা কম্বল গায়ে দিয়ে ঘুমোতে বেশ আরামই লাগে। তুমি আলো নিভিয়ে দাও।

বিছানায় শোওয়ার পর ঘুম আসতে সুধন্যর দেরি হয় না। আজ কিন্তু সে ঘুমোল না।

শীলা কম্বলের তলায় ঢুকতেই সে দ্রুত পাশ ফিরে তাকে জড়িয়ে ধরল। ঠোঁট ডোবাল শীলার ঠোঁটে।

দীর্ঘ চুম্বন শেষ হলে শীলা হেসে বলল, একটু আগে ঠোঁটে ক্রিম মেখেছি। তুমি সেই ক্রিম খেলে তো ?

সুধন্য বলল, তোমার ঠোঁটের ক্রিমও আমার মিষ্টি লাগে । সে এক হাত রাখল শীলার বুকে। অন্য হাতটা নেমে গেল নিচের দিকে। নাইটি সরিয়ে দেখার চেষ্টা করল শীলা প্যান্টি পরে আছে কি না।

সেই হাতের ওপর একটা হাত রেখে শীলা বলল, আজ থাক ।

সুধন্য বিস্মিতভাবে বলল, কেন ? তুমি টায়ার্ড ?

না, তা নয়। বোধহয় আমার পিরিয়ড শুরু হয়েছে।

বোধহয় কথাটা সুধন্যর পছন্দ হলো না। বোধহয় আবার কী ? শুরু হয়েছে, কিংবা হয় নি। শুরু হলেও প্রথম দিনে কোনো অসুবিধা হবার কথা নয়।

সুধন্য অবশ্য কোনো দিনই জোর খাটায় না। সে প্রশ্নই ওঠে না।

মনে মনে একটু আহত বোধ করলেও সে বলল, আচ্ছা, ঠিক আছে। গুড নাইট ।

সে পাশ ফিরে শুলো। কিছুদিন ধরেই শীলার এরকম চলছে। কিছুতেই রাজি হয় না।

উত্থিত পুরুষাঙ্গটি শান্ত না হলে ঘুম আসে না। তাই তার চোখ জুড়াতে একটু সময় লাগল।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছে তার ঠিক নেই। যখন সে গভীর ঘুমে, তার মধ্যে শীলা তাকে জোরে ধাক্কা দিয়ে বলল, এই, ওঠো, ওঠো।

এইরকম সময়ে প্রথমে বোঝাই যায় না, কোথায় সে শুয়ে আছে, ঘরটাই বা কেমন। চোখ মেলার বেশ কয়েক মুহূর্ত পরে বলল, কী কী হয়েছে ? বাথরুমে যাবে ?

শীলা বলল, শুনতে পাচ্ছ ?

কী শুনব ?

পায়ের আওয়াজ। বাইরে কেউ হাঁটছে।

কয়েক মুহূর্তে উৎকর্ণ থাকার পর সুধন্য বলল, কই, কিছু শুনছি না তো।

ভালো করে শোনো ।

না, আমি কিছু শুনতে পাচ্ছি না।

আমি স্পষ্ট শুনতে পাচ্ছি, আর তুমি পাচ্ছ না কেন ? তার কারণ, আমার চেয়ে তোমার কল্পনাশক্তি অনেক বেশি। তুমি কি মনে করছ শীলা, রানী বাইরে ঘুরে বেড়াচ্ছে

চোর-টোরও তো হতে পারে।

আজকাল সবাই ক্রেডিট কার্ড নিয়ে ঘোরে। মেয়েদের গয়নাও আসল সোনার নয়। চোরেরাও এটা জেনে গেছে। বাইরে কেউ নেই। বড়জোর বাঁদর ঢুকতে পারবে না।

তার মানে, তুমি বিছানা ছেড়ে উঠে একবার দেখতে চাও না, তাই না ? ঠিক আছে, আমি দেখছি।

এবারে সুধন্যর স্বামীর অধিকার বোধ জেগে উঠল। সে শুয়ে থাকবে, আর স্ত্রী মাঝরাতে দরজা খুলে দেখবে, বাইরে কেউ আছে কি না, এ তো হতেই পারে না।

সে ধড়মড় করে উঠে পড়ল। সঙ্গে কোনো অস্ত্র নেই, চোর-টোর এলে লড়াই করা যাবে না। দেখা যাক ।

দরজার দুটো ছিটাকনি সে খুলে দিল।

এখন বাইরে দুধের মতোন নরম জ্যোৎস্না ছড়িয়ে আছে। কোনো জনপ্রাণীর চিহ্ন নেই।

ঘর থেকে কয়েক পা বেরিয়ে এল সুধন্য। এখন পাহাড়গুলোর রেখা বোঝা যাচ্ছে কিছুটা। কী একটা রাত পাখি ডেকে উঠল।

সুধন্যর এবার ইচ্ছে হলো এই জ্যোৎস্নায় কিছুক্ষণ ছাদে ঘুরে বেড়াতে। কিন্তু কনকনে হওয়ায় তার শরীর কাপিয়ে দিল। এত ঠান্ডায় কবিত্ব করা যায় না।

সে দৌড়ে ঘরের মধ্যে এসে দরজা বন্ধ করতে করতে বলল, কিছু নেই বাইরে। এমনকি বাঁদরগুলোও আসে নি ।

শীলা বলল, সারি, তোমাকে শুধু শুধু বিছানা থেকে তুললাম। রিয়েলি সারি।

কম্বলের তলায় ঢুকতে ঢুকতে সুধন্য বলল, সারি বলার বদলে আমাকে একটা চুমু দিলে বেশি খুশি হতাম।

একথা শুনে শীলা হাসল। কিন্তু চুমু দিল না। আজ সত্যিই তার ও ব্যাপারে মুড নেই।

একটা হাত বাড়িয়ে সে সুধন্যর বুকের ওপর রেখে খুব নরম গলায় জিজ্ঞেস করল, হ্যাঁ গো, তুমি বাইরে গিয়ে নিশ্চয়ই কিছু দেখেছিলে, তাই না ? আসলে বলতে চাইছ না।

সুধন্য দারুণ অবাক হয়ে বলল, কিছু দেখেছি ? কী দেখব ? দেখলে তোমাকে বলব না কেন ? কেউ নেই, কিছু নেই, বললাম তো, বাঁদরগুলোও নেই ।

সত্যি কেউ নেই ?

একমাত্র আকাশের চাঁদ ছাড়া আর কিছুই দেখি নি।

তাহলে আমি পায়ের আওয়াজ শুনলাম কেন ? একেবারে স্পষ্ট । কেউ যেন গুনগুন করে গানও গাইছিল।

পায়ের আওয়াজ তুমি ঘুমের মধ্যে শুনেছ। গানও সেই ভাবেই। জেগে উঠে কিছু শোন নি। ঘুমের মধ্যে ওরকম অনেক কিছু হয়।

কিন্তু জেগে উঠেও তো, তোমাকে যে বললাম— তখন তুমিও শোন নি

আমি শুনি নি। আওয়াজ হচ্ছে একটা ফিজিক্যাল ব্যাপার। তুমি শুনবে আর আমি শুনব না, তা তো হতেই পারে না ! আমি তো কানে কালা নই।

তা হলে ?

কুহু প্লিজ, এসব কথা আমরা আবার কাল সকালে আলোচনা করব। এখন আমি একটু ঘুমোই ? পাশ ফিরে সত্যি সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ল সুধন্য।

সকালের রোদ এসে মুখে পড়ার পর সে চোখ মেলল।

বিছানায় পাশে শীলা নেই।

শীতের সকালেই বিছনায় বেশি আরাম, আর একটু শুয়ে থাকতে ইচ্ছে করলেও কম্বল সরিয়ে উঠে পড়ল সুধন্য। বেড়াতে এসে বেশি ঘুমিয়ে সময় নষ্ট করার কোনো মানে হয় না।

বাথরুমের দরজাটা বন্ধ ।

বিছানা ছাড়তেই বেশ জোর হিসি পেয়ে গেল সুধন্যর। শীলা বাথরুমে গেলে সহজে বেরতে চায় না।

সুধন্য বাথরুমের দরজার কাছে গিয়ে নিচু গলায় ডাকল, কুহু কুহু!

কোনো সাড়া নেই। ভেতরে কোনো শব্দও নেই। কয়েকবার ডাকার পর ঠেলা দিতেই খুলে গেল দরজাটা।

ভেতরে শীলা নেই।

তা হলে সে গেল কোথায় ? এত সকালে ?

একটা চাদর গায়ে জড়িয়ে বাইরে বেরিয়ে এল সুধন্য।

তারপরই সে দেখল এক অত্যাশ্চর্য দৃশ্য।

ছাদের মাঝামাঝি একটা মোড়ার ওপর বসে আছে শীলা। রাতপোশাকের উপর একটা লাল রঙের ওড়না জড়ানো অদূরে সার বেঁধে বসে আছে বাঁদরের দল। শীলা তাদের বিস্কুট খাওয়াচ্ছে। এই বিস্কুট আনা হয়েছে কলকাতা থেকে।

একটুক্ষণ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইল সুধন্য।

মানুষ বদলায় ঠিকই, কিন্তু এক রাতে এতখানি পরিবর্তন কোনো মানুষের পক্ষে সম্ভব? বাঁদর সম্পর্কে এত ভয় শীলার, কী করে কেটে গেল ? আজ তার মুখে ভয়ের চিহ্নমাত্র নেই, হেসে হেসে সে কী যেন বলছে বাঁদরদের। বাঁদরেরাও বেশ শান্ত হয়ে আছে, লাফিয়ে লাফিয়ে বিস্কুট ধরে খাচ্ছে।

আলতাফের মুখে শোনা গেছে যে এই প্রাসাদের অধিষ্ঠাত্রী রানী রোজ বাদরদের কিছু না কিছু খাওয়াতেন। শীলার গায়ে একটা ওড়না জড়ানো, ওর ধারণা সেটা ছিল সেই রানীর, আর সেই রানীর ভঙ্গিতেই বাঁদরদের বিস্কুট খাওয়াচ্ছে শীলা।

সুধন্য ভাবল, আগেকার দিনে মানুষ ভাবত, অনেককাল আগে মৃত এক রানীর আত্মা শীলার ওপর ভর করেছে। দুজনেরই এক নাম। তাই এই শীলা ওই শীলার মতোন ব্যবহার করছে।

যদিও রাজস্থানি মেয়ের শীলা নামটা খুব স্বাভাবিক নয়, কিন্তু আলতাফ তো এই নামই বলেছে। জায়গাটার নাম শিলিশের, হয়তো এই নামের সঙ্গে কোনো যোগ আছে।

কিন্তু সুধন্য অ্যাস্ট্রো-ফিজিক্সের ছাত্র। সে জানে, ওইসব আত্মা ভর করা-টরা একেবারেই গল্পকথা। ওরকম কিছু হতেই পারে না। মানুষের আত্মা বলে কিছু আছে কিনা, সেটাও আজও প্রমাণিত হয় নি।

তবে মানুষের মন বড় জটিল। আজও মানুষের মনের সব রহস্য বিজ্ঞান বাখ্যা করতে পারে নি। কোন কথা শুনে কার মনে কী প্রতিক্রিয়া হতে পারে তা বলা যায় না। রানী শীলাদেবীর কাহিনী শুনে সুধন্যর এমন কিছুই নতুন মনে হয় নি, কিন্তু শীলার মনে সেটা অনেকখানি ছাপ ফেলেছে । এমনকি আয়নায় রানীর মুখ পর্যন্ত দেখে ফেলেছিল, যেটা কল্পনা ছাড়া আর কিছুই নয়।

শীলা এমনিতেই বেশি কল্পনাপ্রবণ। সেই অ্যাকসিডেন্টের পর ওর মনটা খুবই নরম হয়ে আছে। আমেরিকার তিনজন ডাক্তার বলেছে, ওর ব্রেনে কোনো চোট লাগে নি। ওর কোনো ক্ষতি হয় নি। তবু ওর সঙ্গে খুব সাবধানে ব্যবহার করতে হয়। নিশ্চয়ই আস্তে আস্তে ঠিক হয়ে যাবে। লীলার খামখেয়ালিপনার কোনো প্রতিবাদ করে না সুধন্য।

শীলা এবার মুখ ফেরাল। সুধন্যকে যেন সে চিনতেই পারল না।

সুধন্যরও মনে হলো, এই মুখখানা যেন তার অচেনা। চোখের দৃষ্টি সুদূর । তবু সে আপনমনে একটু হেসে এগিয়ে গেল শীলার দিকে।

কাছে এসে সে বলল, কী সুন্দর দেখাচ্ছে তোমাকে । বাঁদরগুলো তোমার পোষ মেনে গেছে দেখছি। কিন্তু গরম জামা পরো নি কেন ? ঠাণ্ডা লেগে যাবে যে ?

নিজের শালটা খুলে সে জড়িয়ে দিল শীলার গায়ে।

৪

ভরতপুর থেকে ফিরতে ফিরতেই রাত সাড়ে আটটা বেজে গেল।

গাড়ি থেমে নেমে তপন বলল, সকালবেলা লেকটা ফগে ঢাকা ছিল, কিছুই দেখা যায় নি। এখন অন্ধকার। এখানকার দৃশ্যটা ঠিক উপভোগ করা যাচ্ছে না ।

সুধন্য বলল, একটু পরে চাঁদ উঠবে। তখনো একটা অন্যরকম রূপ হয়, বাইরে বসলে—কিন্তু শীতের চোটে বাইরে তো বসবার উপায় নেই।

তপন বলল, এবার বড় বেশি শীত পড়েছে। দিল্লির থেকে এখানে অনেক বেশি।

শীলা বলল, পরশু থেকে আর কুয়াশা হবে না।

তপন বলল, তাই নাকি ? তুমি কী করে জানলে ?

শীলা বলল, পরশু তো শনিবার ? শনি আর রবিবার এখানে কুয়াশা হয়না ।

তপন বিরাট জোরে অট্টহাসি করে বলল, তাই নাকি ? শনি-রবিবার কুয়াশা হয় না ? এ কথা জীবনে শুনি নি। তা তুমি কী করে জানলে ?

শীলা বেশ জোর দিয়েই বলল, হ্যাঁ, হয় না, আমি জানি। তপন বলল, আমরা তো এখানে আছি মাত্র দুদিন। তুমি তো কোনো শনি-রবিবার এখানে থাকই নি।

সুধন্য উদ্বিগ্নভাবে তাকিয়ে রইল। শীলার এই ধরনের অযৌক্তিক কথা সে মেনে নেয়। কিন্তু তপন যদি বেশি ঠাট্টা-তামাশা শুরু করে ?

কথা ঘোরাবার জন্য সুধন্য বলল, আমরা তো আর শনিবার পর্যন্ত এখানে থাকছি না, সুতরাং দেখাও হবে না। কালই ফিরতে হবে।

তপন চোখ সরু করে শীলার দিকে তাকিয়ে বলল, খুব একখানা দিলে ? অ্যাঁ ? শনিবার-রবিবার ফগ থাকে না। ভেরি স্মার্ট। প্রথমে আমিও বুঝতে পারি নি। চল, আজ আমার ঘরে কিছুক্ষণ বসি।

তপনের ঘরে খানতিনেক চেয়ার আছে, অন্য ঘরে তা নেই। এ ঘরে পুরোনো আমলের আসবাবপত্র কিছুই নেই, সাধারণ হোটেলের ঘরের মতোন আয়তনে বেশ বড় এই যা।

তপন বলল, আমার কাছে হুইস্কি আছে, খানিকটা ভডকাও আছে। শীলা, তুমি কি খাবে ?

বিদেশে প্রায় সব বাড়িতেই সামাজিকভাবে কিছু না কিছু পানীয়ের ব্যবস্থা থাকে। যারা মদ্যপান করে না, তারা অন্যদের সঙ্গে কোনো ঠান্ডা পানীয়ের গেলাস হাতে নেয়। সুধন্য হুইস্কি পছন্দ করে, আর শীলা ভডকার সঙ্গে অরেঞ্জ স্কোয়াশ ভালোবাসে ।

সুধন্য বলল, তপন একটা অরেঞ্জ স্কোয়াশ দিতে বল তো কুহু ভডকার সঙ্গে মিশিয়ে খাবে।

শীলা সঙ্গে সঙ্গে বলল, না, না, আমি তো ওসব খাই না।

তপন ভুরু তুলে বলল, খাও না ? গত বছরও তো তুমি–

শীলা তবু জোর দিয়ে বলল, না, খাই না। তোমরাও কেউ এসব খাবে না ।

তপন মাথা নাড়তে নাড়তে বলল, এটা যে বড় বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে শীলাদেবী। এই ঠান্ডার মধ্যে একটু গা গরম করব না ? তোমার বরের কথা জানি না। সে হয়তো তোমার কথা মানতে পারে, কিন্তু আমি তো একটু খাবই! তোমাদের জন্য একটু কোল্ড ড্রিংকস আনাব ?

শীলা বলল, আমার কিচ্ছু চাই না।

তপন ঘরের কোণে গিয়ে ফোনটা তুলল। তার এক বোতল সোডা দরকার ।

ফোনটা আচল ।

এখানে এই এক মুশকিল। মোবাইল ফোনের টাওয়ার নেই। ইন্টারনাল ফোন কখনো চলে, কখনো চলে না।

বিরক্ত হয়ে তপন বাইরে যাবার জন্য দরজা খুলতেই দেখল, সেখানে দাড়িয়ে আছে আলতাফ ।

সে বলল, সেলাম আলেকুম। গুড ইভনিং স্যার। আপনাদের কিছু লাগবে ? ফোনটা তো কাজ করছে না হঠাৎ ।

তপন বলল, আলাইকুম আস-সালাম। আপনি ঠিক এই সময় হাজির হলেন কী করে ? টেলিপ্যাথি নাকি ?

আলতাফ বলল, দেখলাম একটু আগে আপনারা ফিরে এলেন। কিছু লাগতে-টাগতে পারে। অফিস ঘর থেকে এই ঘরে ট্রাই করলাম, রিং হলো না। মাফ করবেন স্যার, আমি একটা জিনিস দেখতে পারি ?

কি ? আপনার ঘরের ফোনটাই কিছু গড়বড় করছে কি না, একটু চেক করে দেখব ?

সে এসে ফোনের যন্ত্রটা উল্টে-পাল্টে, তার ধরে নাড়াচাড়া করার পর বলল, লুজ কানেকশান হয়েছিল। এখন ঠিক হয়ে গেছে। আপনাদের কী লাগবে বলুন, ক্যান্টিনে জানিয়ে দিচ্ছি ?

তপন বলল, গোটা দু'এক সোডা, এক বোতল ঠান্ডা পানি, আর যদি পারেন দু'প্লেট পেঁয়াজি।

ফোনে একটু কথা বলে আলতাফ জানাল, পেঁয়াজি হবে না, তবে ডিম ভাজা হতে পারে।

তপন আলতাফকে বলল, আপনি একটু বসুন না আমাদের সঙ্গে । আপনার খুব কাজ নেই তো ?

আলতাফ বলল, না, না, আমার এখন কোনো কাজ নেই।

মনে হল যে, এ ঘরে আড্ডা দেবার জন্যই সে প্রস্তুত হয়ে এসেছিল।

বোতল বার করে নিজের গেলাসে ঢালতে ঢালতে তপন তার বন্ধুকে জিজ্ঞেস করল, কী রে, তুই খাবি কি খাবি না ?

তপন জানে, সুধন্য হুইস্কি পান করে প্রায় রোজই। আজ তার সামনে বউয়ের কথা শুনে পান না করলে পরে তপন তা নিয়ে নিশ্চয়ই খুব ক্ষ্যাপাবে!

একবার শীলার দিকে তাকিয়ে সুধন্য বলল, হ্যাঁ খাব। সোডা দিস না শুধু জল।

তপন আলতাফকে জিজ্ঞেস করল, আপনার চলবে ?

আলতাফ সলজ্জভাবে বলল, একটুখানি চলতে পারে!

শীলা তার দিকে তাকিয়ে বলল, আপনিও ড্রিংক করেন ? আপনাদের ধর্মে নিষেধ আছে না ?

আলতাফ খুব বিনীতভাবে বলল, ম্যাডাম, ধর্মের সব নির্দেশ কি সব মানুষ অক্ষরে অক্ষরে পালন করতে পারে ? কেউ কেউ পারে, সবাই পারে না। আপনাদের ধর্মের সব নির্দেশই কি আপনারা মানেন ?

তপন হাসতে হাসতে বলল, মদ্যপান বিষয়ে যে আমাদের ধর্মে কী নির্দেশ আছে, তা আমি জানিই না। মানুক বা না মানুক, মুসলমানেরা কিন্তু তাদের শাস্ত্রের সবকিছু জানে।

শীলা বলল, আমি ছোটবেলা থেকে আমার বাবাকে ড্রিংক করতে দেখেছি।

তপন বলল, এই, এই, তাহলে তুমি আমাদের বারণ করছিলে কেন ? নিজের বাবাকে কখনো বারণ করেছ ?

শীলা কিছুটা অবাক হয়ে বলল, তোমাদের বারণ করেছি নাকি ? কখন করলাম ? আমার বাবা গেলাসে কয়েক চুমুক দেবার পর খুব সুন্দর কথা বলতেন। কত দেশ-বিদেশের কথা। হুইস্কির গন্ধটাও আমার বেশ ভালো লাগে।

তপন বিমূঢ়ভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে থেকে বলল, আজ তো দারুণ দিচ্ছ তুমি, শীলা। পিলে চমকে যাচ্ছে। এমন হিউমার, ধরতেই পারছি না। তা হলে তুমি ভডকা খাবে ?

শীলা বলল, বাঃ, আমাকে বাদ দিয়ে বুঝি আপনারা সবাই খাবেন ?

সুধন্য আলতাফকে জিজ্ঞেস করল, আপনি এখানে কতদিন আছেন ?

আলতাফ বলল, সাড়ে চার বছর হয়ে গেল ।

আপনাদের তিন বছর অন্তর ট্রান্সফার হয় না ?

হ্যাঁ হয়। আমাকে প্রোমোশন দিয়ে জয়সলমিরে পাঠানোর অর্ডার হয়েছিল। আমি যাই নি। আমার এই জায়গাটাই বেশ ভালো লাগে।

সে কী। এত নির্জন জায়গা কয়েকটা দিন বেশ ভালো লাগে । তারপর তো হাঁপিয়ে উঠতে হয়। এখানে অনেক কিছুই পাওয়া যায় না। ফোনে কানেকশান হয় না।

তা হোক। তবু আমার কেমন যেন নেশা ধরে গেছে। গ্রীষ্মকালে এমনও হয়, সপ্তাহের পর সপ্তাহ রুমগুলো খালি থাকে, কেউ আসে না। কাজের লোকেরা সন্ধের পরই চলে যায় গ্রামে। আমি একা। তখনো আমি বারান্দায় চেয়ার নিয়ে লেকের দিকে চেয়ে চেয়ে অনেক রাত পর্যন্ত কাটিয়ে দিই।

তপন বলল, এত বড় প্যালেসটায় আপনি একা থাকেন, কখনো অস্বাভাবিক কিছু দেখেন নি কিংবা শোনেন নি ? মানে, অলৌকিক কিছু ?

আলতাফ বলল, নাঃ! কোনো দিন না।

তপন হতাশ হবার ভঙ্গি করে বলল, নাঃ ভূত-টুতের গল্প কিছু নেই ? আপনি যে বলেছিলেন, রানী শীলাদেবী ফিরে ফিরে আসেন ?

শীলা তীক্ষ্ণ গলায় বলল, আমার ভূতের গল্প একদম ভালো লাগে না। তোমরা অন্য কথা বলো।

সুধন্য বলল, রাজপুত রাজা বিনয় সিং আর তার এই গ্রামের রানী শীলাদেবীর কোনো ছবি নেই ? মানে পেইন্টিং ?

আলতাফ বলল, রাজার ছবি আছে আলোয়ারে। রানীদের ছবি আঁকারতো রেওয়াজ ছিল না । সেকালে রাজপুত মেয়েরা পর্দানশিন ছিলেন!

তপন বলল, রানী পদ্মিনীর কথা মনে নেই ?

আলতাফ বলল, তবে, আমাদের অফিস ঘরের আলমারিতে একটা ছবি আছে । এক মহিলার। ফ্রেমটা পচে গিয়েছিল, তাই ছবিটা গুটিয়ে আলমারিতে রেখে দেওয়া হয়েছে। আমার আগে যিনি ম্যানেজার ছিলেন, তিনি বলতেন, ওটা রানীরই ছবি । ওটা অবশ্য পোর্ট্রেট নয়। অনেক পরে কেউ এক জন মন থেকে রানীর কথা ভেবে এঁকেছিল ।

রানীকে সেই আর্টিস্ট দেখেছিল ?

না ।

তা হলে আর তাকে আঁকবে কী করে ?

গল্প চলল আরও ঘন্টাখানেক । তারপর খেতে যাওয়া হলো নিচে ।

রাত দশটা বেজে গেছে । এরপর যে যার ঘরে ।

পোশাক পালটে একটা সিগারেট ধরাল সুধন্য ।

শীলার এখন রাত্রিকালীন প্রসাধন চলবে কিছুক্ষণ ।

একটু বাদে কৌতুকের ছলে সুধন্য জিজ্ঞেস করল, আজ আবার বাথরুমের আয়নায় রানীকে দেখবে নাকি ?

শীলা ঝট করে ফিরে তাকিয়ে বলল, এ কথা বললে কেন ? আমি কি ভূত দেখি নাকি ?

ভূত কেন হবে ? মনের ছবি । তুমিই তো বলেছিলে -

মনের ছবি ? আমার মনের যে কী হয়েছে, আমি নিজেই তার হদিশ পাচ্ছি না । মাঝে মাঝে সব উলট-পালট হয়ে যাচ্ছে ।

কিচ্ছু হয় নি। তুমি একটু বেশি সেনসিটিভ হয়ে আছ।

আমি পাগল হয়ে যাব না তো ?

তুমি যদি নিজে না চাও, তাহলে হবে না। কুহু, ডাক্তারের বলেছেন, তুমি সম্পূর্ণ সুস্থ।

সত্যি ?

একদম সত্যি!

এরপর বাথরুমে গিয়ে অনেকটা সময় লাগিয়ে দিল শীলা। সুধন্য দু'একবার ভাবল, দরজায় ধাক্কা দেবে কি না। দিল না।

প্রায় পঁয়তাল্লিশ মিনিট পরে দরজা খুলল শীলা।

এখন তার মুখের চেহারা আবার অন্যরকম।

সুধন্যর দিকে না তাকিয়ে সে পোশাক খুলতে লাগল।

সুধন্য একবার গলা খাকারি দিয়ে বলল, আমি একটা কথা জিজ্ঞেস করতে পারি ?

বলো ।

এতক্ষণ লাগল। শরীর খারাপ হয় নি তো ?

না। তুমি জানতে চাইছ তো যে আজও আমি আয়নায় কোনো ছবি দেখেছি কি না ? না দেখি নি। দেখি নি। তবে কথা শুনেছি। এতে কোনো ভুল নেই।

কার কথা ?

সেই রানীর। খুব মিষ্টি গলা। হেসে হেসে কথা বলছিল, আমার সঙ্গে অনেক গল্প হলো ।

গল্প হলো ? কী আশ্চর্য! কী ভাষায় তোমরা কথা বললে ? সেকালের এক রাজস্থানের মেয়ে, নিশ্চয়ই রাজস্থনি ভাষা ছাড়া আর কিছুই জানত না। ইংরেজি জানার তো প্রশ্নই ওঠে না। আর তুমিও হিন্দি ভালো জানো না-

সে তুমি বুঝবে না। সেই রানী খুব দুঃখী ছিলেন। ওঁর কোনো ছেলেমেয়ে হয় নি।

এ কথা তোমাকে বললেন উনি ? না তা বলেন নি। আমি বুঝে নিয়েছি।

এইসব নিয়ে আলোচনা আর চালাতে চায় না সুধন্য। চুপ করে থাকাই ভালো। সে শুয়ে পড়ল।

কয়েক মিনিট বাদে শীলা তার কাছে এসে দাঁড়িয়ে বলল, শোনো, তোমাকে একটা কথা বলতে চাই। আমি এখান থেকে আর যাব না। আমি এখানেই থেকে যেতে চাই।

প্রথমে নিজের শ্রবণশক্তিকেই যেন বিশ্বাস করতে পারল না। সে জিজ্ঞেস করল, কী বললে ?

মালা এবার বেশ দৃঢ় গলায় বলল, আমি এখান থেকে আর যাব না। এখানেই থাকব।

অর্ধেক উঠে বসে সুধন্য বলল, এখানেই থাকবে মানে ? কতদিন থাকবে ? আমাদের কাল পর্যন্ত বুকিং।

চুলোয় যাক বুকিং। আমি যতদিন বাঁচব, এখানেই থাকতে চাই।

এটা কী পাগলামি হচ্ছে শীলা ?

মাছরাঙা পাখির মতোন তীক্ষ্ণ স্বরে হেসে উঠে শীলা বলল, জানতাম, তুমি আমাকে পাগল সাজাবে। স্ত্রীদের কোনো ব্যবহার পছন্দ না হলেই স্বামীরা এরকম বলে। এতেই তাদের সুবিধে ।

আহতভাবে চুপ করে গেল সুধন্য। শীলা এর আগে কখনো এতটা আঘাত দিয়ে কথা বলে নি।

শীলা আবার বিদ্রূপের সুরে বলল, তুমি নিশ্চয়ই ভাবছ, আমি টাকা কোথায় পাব। এটা একটা হোটেল। আমায় তো বিনা পয়সায় থাকতে দেবে না। আমার যা সেভিংস আছে,

গয়না-টয়না যা আছে, তা দিয়ে যতদিন চলে চলবে। তারপর কী হবে জানি না। ভয় নেই, তোমার কাছ থেকে টাকা চাইব না।

সুধন্য শান্তভাবে বললল, না, আমি মোটেই সে ভয় পাচ্ছি না। টাকাপয়সার কথা ভাবছিই না।

তবে কী ভাবছ ?

তা এখন বলতে চাই না। কুহু, এখন বরং শুয়ে পড়ো। কাল সকালে উঠে ঠান্ডা মাথায় এই নিয়ে চিন্তা করা যাবে।

আমার মাথা যথেষ্ট ঠান্ডা আছে। সুধন্য, তোমাকে এক্ষুনি একটা প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। আমি যদি এখানে থেকে যেতে চাই, তুমি কি জোর করে আমাকে ধরে নিয়ে যাবে ?

না ।

সব স্বামীরাই তো তাই করে।

অন্য স্বামীদের কথা আমি জানি না। কুহু, আমি কি তোমার ওপর কোনোদিন কোনো কারণে জোর করেছি ? কোনোদিন ?

তা হলে কী করবে ? তুমি চলে যাবে ?

না, আমি মোটেই চলে যাব না। তুমি যদি এখানে থেকে যেতে চাও, আমিও থাকব তোমার সঙ্গে ।

তুমি থাকবে কী করে ? না, না, তুমি কথার কথা বলছ। তুমি থাকতে পারবে না।

হ্যাঁ, আমি থাকব।

তোমার চাকরি ? চুলোয় যাক চাকরি ।

আর তোমার বাড়ি ? সেটার কী হবে ? অত শখ করে বাড়ি কিনলে।

বাড়ি আমি একা কিনি নি কুহু। দুজনে মিলে কিনেছি। কত বাড়ি দেখেছি, শেষ পর্যন্ত তোমার পছন্দমতন বাড়িটাই কেনা হয়েছে । পুরো টাকা তো শোধ হয় নি। ব্যাংকের কাছে অনেক ধার আছে। ব্যাংককে জানিয়ে দেব, বাড়িটা বিক্রি করে দেবে ।

কেন, সব ছেড়েছুড়ে তুমি এখানে থাকতে চাইছ ?

কারণ তুমি থাকবে, তাই আমিও তোমার সঙ্গে থাকব।

কেন থাকবে, সেটাই তো আমি জানতে চাইছি ।

তুমিই তো বললে, এটা আমার পাগলামি।

এবারে সুধন্য হাসল। সিগারেটের প্যাকেটের জন্য এদিক-ওদিক হাতড়াতে হাতড়াতে সে বলল, এর উত্তরটা তো খুবই সহজ। কারণ আমি তোমাকে ভালোবাসি। তোমার সঙ্গে আমি আমার জীবনটা জড়িয়ে নিয়েছি।

শীলাও বেশ জোরে হেসে বিদ্রূপের সুরে বলল, ভালোবাসা! পুরুষেরা যখন-তখন এই কথাটা উচ্চারণ করে, অথচ তার মানেই জানে না। তারা ভাবে, এই কথাটা শুনলেই মেয়েরা একেবারে গলে যাবে। যায়ও অনেক মেয়ে। আমিও একসময় বোকা ছিলাম ।

সুধন্য ঝুঁকে পড়ে শীলার হাত ধরে আন্তরিক মিনতি করে বলল, কুহু, প্লিজ, এখন শুয়ে পড়ো। সকালবেলা আমরা এই নিয়ে সিরিয়াসলি কথা বলব ।

বেশ জোরে নিজের হাত ছাড়িয়ে নিয়ে ঝাঁঝের সঙ্গে শীলা বলল, না, আমি শোব না। আর কোনোদিন তোমার সঙ্গে এক বিছানায় শোব না। আমি সারা জীবন একা থাকতে চাই।

শীলার গলার আওয়াজ শুনেই বোঝা যায়, এ কথাগুলো যেন তার নিজের নয়। কেউ তাকে দিয়ে বলাচ্ছে। এরকম কড়া কথা শীলা তাকে কখনো বলে নি। কোনো ঝগড়াও তো হয় নি দু'মাসের মধ্যে।

সিগারেটের প্যাকেটটা খুঁজে পেয়ে সুধন্য একটা ধরাল। চুপ করে রইল একটুক্ষণ।

তারপর আস্তে আস্তে বলল, কুহু, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞেস করব ? তুমি ঠিক উত্তর দেবে ?

শীলা উত্তপ্ত গলায় বলল, কেন উত্তর দেব না ? আমি কি তোমাকে ভয় পাই নাকি ?

ভয়ের কথা হচ্ছে না। আমি জানতে চাইছি, তুমি কি কোনো কারণে এই প্যালেসের যে রানী ছিলেন, শীলদেবী, তারঁ সঙ্গে নিজের কোনোরকম যোগাযোগ—

যোগাযোগ মানে ? এক শ বছর আগে যিনি মারা গেছেন, তাঁর সঙ্গে কোনো যোগাযোগ হতে পারে নাকি ? অ্যাবসার্ড !

তবে যে বললে, তুমি তাঁর কথা শুনেছ ?

সেটা তো আমি নিজের মনে মনে শুনেছি। নিজেই নিজেকে বলেছি । সবটাই আমার বানানো। এ তো ঠিকই বলছ! স্বাভাবিক কথা । তা হলে আমার ওপর হঠাৎ এত রাগ হলো কেন ?

রাগের কী আছে! কাল থেকে আমার মনে হচ্ছে, তুমি আসলে রাজা বিনয় সিং-এর বংশধর!

অ্যাঁ! কী বলছ তুমি ? আমি রাজপুত রাজার বংশধর ? আমি ডালভাত খাওয়া বাঙালি, জীবনে কখনো ঢাল-তলোয়ার ছুঁয়েই দেখি নি। আমার চৌদ্দ পুরুষ ভেতো বাঙালি ।

সে কথা বলছি না। তোমরা একই। মেয়েদের তোমরা মানুষ বলেই গণ্য করো না। গ্রাম থেকে তুলে এনে একটা মেয়েকে বিয়ে করলে, ঐশ্বর্য দেখাবার জন্য এতবড় একটা প্যালেস বানিয়ে দিলে, তারপর দু'একবার মাত্র দেখা দিয়ে আর এলেই না। সে মেয়েটির কী হলো না হলো, সে কী চায়, সে কীভাবে বেঁচে আছে, তা গ্রাহ্যই করলে না!

কী বলছ, কুহু! এসব আমি করেছি ?

নিশ্চয়ই করেছ!

আমি তোমাকে অবহেলা করেছি ? তোমার থেকে কখনো দূরে থেকেছি ?

অফকোর্স ! অফিসের কাজের নামে মাসের মধ্যে চৌদ্দ দিন চলে যাও নি ?

সে তো সত্যিই অফিসের কাজ। ওদেশে এরকম হয়ই।

আমি তোমার সঙ্গে তর্ক করতে চাই না। মোট কথা আমি এখানে একলা থাকতে চাই। তুমি চলে যাও!

না, তুমি এখানে থাকলে আমিও থেকে যাব। বলছি না, আমি একা থাকতে চাই। একেবারে একা। চাঁদের আলোয় একা একা ঘুরব।

কুহু, তুমি একটু আগে বলছিলে, তুমি এখানে থাকলে আমি জোর করে তোমায় নিয়ে যাব কি না। আমি যদি এখানে থাকতে চাই, তুমি জোর করে আমায় তাড়িয়ে দিতে পারবে ?

এ কথার উত্তর না দিয়ে হঠাৎ পেছন ফিরে দরজা খুলে বাইরে বেরিয়ে গেল শীলা।

সুধন্যও সঙ্গে সঙ্গে ছুটে এল বাইরে। শীলার গায়ে শুধু পাতলা রাতপোশাক। বাইরে হু-হু শীতের বাতাস।

আমি তোমাকে কখনো জোর করি না। এখন জোর করতে বাধ্য হব। এই ঠান্ডায় ঘুরলে তোমার নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া হয়ে যাবে। ঘরে চলো ।

শীলা বেপরোয়াভাবে বলল, না, যাব না। সুধন্য, আমার মাথায় চোট লেগেছিল। আমি অন্য মানুষ হয়ে গেছি। আমি আর তোমার বউ নই। তুমি আমাকে ছেড়ে দাও!

সুধন্য বলল, না, মাথায় চোট লাগার জন্য তোমার কোনো ক্ষতি হয় নি। এটাও তোমার কল্পনা। শিগগির ঘরে চলো।

না যাব না!

সুধন্য দু'হাত দিয়ে জড়িয়ে ধরে শীলাকে টেনে আনতে লাগল ঘরের দিকে। শীলার ঝটাপটিতে বারবার সুধন্যর হাত লেগে যেতে লাগল শীলার বুকে।

পুরুষ হিসেবে উষ্ণ হয়ে উঠল তার শরীর ।

খুব কাছে এনে সে শীলাকে চুম্বন করতে গেল। শীলা ঠোঁট ফিরিয়ে নেবার চেষ্টা করেও পারল না। গাঢ় চুম্বন দিল সুধন্য।

দ্বিতীয়বার চুম্বনে শীলা তেমন আপত্তি করল না।

ঘরে এনে বিছানায় শীলাকে শুইয়ে দেবার পরে সুধন্যর পুরুষত্ব জেগে উঠল পুরোপুরিভাবে।

শীলার রাত পোশাকটা তুলে দেখল, জাঙ্গিয়া পরা আছে কি না। নেই। তার মসৃণ উরু ও নারী-চিহ্ন। সুধন্য শুয়ে পড়ল শীলার উপর।

এবার শীলা আর প্রতিরোধ করল না।

পুরো ব্যাপারটা তুমুলভাবে শেষ হওয়ার পর দুজনে পাশাপাশি চুপচাপ শুয়ে রইল কিছুক্ষণ।

একটু বাদে শীলা বলল, এই শুনছ, ঘুমিয়ে পড়লে ?

সুধন্য বলল, না। আমি তোমার উপর জোর করলাম বলে তুমি রাগ কর নি তো ?

এর উত্তর না দিয়ে শীলা আবেশমাখা গলায় বলল, আমরা কবে বাড়ি যাব ? আমার আর মন টিকছে না।

সুধন্য বলল, কোন বাড়ি ? শীলা বলল, আমাদের নিজের বাড়ি। কলকাতার বাড়ি তো আমাদের বাড়ি নয়, তোমার দাদা-বউদির বাড়ি। দুর্গাপুরের বাড়িও তো আমার মা-বাবার বাড়ি। আমাদের আসল বাড়ি ফিলাডেলফিয়ায়। কত শখ করে বাড়িটা কেনা হলো। এসব ভালো করে সাজাতে হবে, আর দেশে থাকতেই ভালো লাগছে না। আমরা কবে ফিরব ?

সুধন্য বলল, আমরা কালই বেরিয়ে পড়ব। এখন ঘুমোও সোনা!

শীলা তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল । ।

=====